সমরেশ বসুর *খণ্ডিতা* : জীবন ও রাজনীতির রূপায়ণ

পারভীন আক্তার*

সারসংক্ষেপ : ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের বিচিত্র পরিসরে ভারতের নানা রাজনৈতিক দলের মতসংঘাত ও অন্তর্ঘাত ভারত-বিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। ঢাকায় বুড়িগঙ্গার কোলে যাপিত-কৈশোরের সমরেশ বসু খণ্ডিত বাংলাকে মেনে নিতে পারেননি। এই বেদনাময় চেতনার শব্দরূপ তাঁর শেষ উপন্যাস *খণ্ডিতা*। নৈহাটি-জগদ্দল শিল্পাঞ্চলের তিন বাঙালি বন্ধু — সতু, বিজু ও গোরা ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের পরিবর্তে খণ্ডিত দেশমাতৃকার অপর অংশ পূর্ব বাংলার মানুষের অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া জানতে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট রাতে ট্রেনযোগে সেখানে যাত্রা করে। চরিত্র তিনটি স্বয়ং সমরেশ বসু, তাঁর বন্ধু গৌর ঘোষ ও সুবল ঘোষ। ১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগস্ট বিকেল থেকে বিশ আগস্ট রাত বারোটা পর্যন্ত সময়পরিসরে বিন্যস্ত এ আখ্যানে ঔপন্যাসিক মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও সংলাপধর্মী পরিচর্যায়, অনেক ক্ষেত্রে গীতময় প্রতীকী ভাষায়, দেশবিভাগের রাজনৈতিক বাস্তবতা চিত্রিত করেছেন। কর্তিত বাংলার রূপক, প্রতিমাসদৃশ মোতিকে অবলম্বন করেই *খণ্ডিতা*র সকল রাজনৈতিক ভাবনা উপন্যাসের শেষে, কুহকবাস্তবতায় তরঙ্গিত হয়েছে। কর্তিত বাংলা, তার লাঞ্ছনাকে বয়ে বেড়াবে কত কাল? এ প্রশ্ন উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সমরেশ বসু ছিন্নবাংলার আরেক ভবিষ্যৎ স্বপ্নকেই সম্প্রসারিত ও প্রতিরূপকায়িত করেন।

ষাটের দশকের স্বপ্নভঙ্গ, সত্তরের দশকের নকশাল-আন্দোলন ও শ্রেণিশত্রু খতমের রাজনীতির রক্তাক্ত অভিজ্ঞতা, আত্মমুক্তির পন্থা হিসেবে আশির দশকে মিথজগৎ পরিক্রমণ শেষে একজন প্রতিশ্রুতিশীল দায়বদ্ধ লেখক হিসেবে সমরেশ বসু (১৯২৪-১৯৮৮) সাহিত্যজীবনের অন্তিম পর্বে এসে প্রত্যাবর্তন করেছেন মানবতার গভীর সংকটকালীন 'আদাব'[১] পর্বে — অবিভক্ত ভারতবর্ষের জনজীবন যখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অভিঘাত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সংকট ও দেশবিভাগের অস্থিরতায় অনিশ্চয়তায় বিপন্ন। সাহিত্যজীবনের অন্ত্য পর্বে তাঁর শিল্পীসত্তার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল বৃহত্তর সমাজমানসের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিমানুষকে দেখা। *খণ্ডিতা*[২] উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের সেই প্রয়াস সুস্পষ্ট। সমরেশ বসু এ উপন্যাসে দেশবিভাগজনিত জটিল সংঘাতদীর্ণ উদ্বেল সময়কে ভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করেছেন।

১৯৪৭ সালের চৌদ্দই আগস্ট বিকেল থেকে বিশ আগস্ট রাত বারোটা পর্যন্ত বিস্তৃত সময়পরিসরে, এ আখ্যানে বিন্যস্ত হয়েছে দেশবিভাগ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিয়ে

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আদমজী ক্যান্টনমেন্ট কলেজ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রিপ্রাপ্ত।

বিভিন্ন চরিত্রের মত-অমত, অভিমত পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ এবং সীমানা কমিশনের বণ্টনব্যবস্থা নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, হিন্দু-মুসলমানের জীবনে ঘনিয়ে আসা অস্তিত্ব সংকটজনিত দুশ্চিন্তা ও বিপন্নতা, সাম্প্রদায়িক স্বার্থ-সংঘাত। নিজস্ব ভাবনার প্রতিনিধিত্বশীল চরিত্রের আলোচনাসূত্রেই সমরেশ বসু 'জাতীয় জীবনের একটি জটিল ও দুর্যোগপূর্ণ সময়কে ধরতে চেয়েছেন' (অশোক সরকার, ২০০০ : ২২৩)। উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য — খণ্ডিত দেশমাতৃকার জন্য সতুর সুগভীর বেদনাবোধ ও তার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার দীপ্র ব্যাকুলতা — স্বল্পপরিসর উপন্যাসে সমরেশ বসু মূলত বিশ্লেষণাত্মক ও সংলাপধর্মী পরিচর্যায়, অনেক ক্ষেত্রে গীতময় প্রতীকী বহুস্তরী ভাষায় উপস্থাপন করেছেন।

খণ্ডিতা সমরেশ বসুর অন্ত্য পর্যায়ের আকস্মিক রচনা নয়। উপন্যাসের অন্তঃপ্রেরণা ঔপন্যাসিক অনেক আগে থেকেই মেধায় ও আবেগে লালন করছিলেন, তাঁর জীবন-অভিজ্ঞতা থেকে। উপন্যাসের ঘটনাংশ ও বোধ, সমরেশ বসুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও মানববাদী প্রগতিপন্থা উৎসারিত; *খণ্ডিতা* তাঁর 'জীবনার্থের রূপান্বিত রূপক'। এ ক্ষেত্রে দুটি উদ্ধৃতি অনুসরণীয় :

> ১ "দুশো বছরের বিদেশী পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তির অনিবার্য শর্ত, দেশ বিভাগের ক্ষত নিয়েই, স্বাধীনতার সেই প্রথম রাত্রে আমাদের পূর্ব পাকিস্তানে যাত্রা। কেন যে গিয়েছিলুম, তার যথার্থ কোনো ব্যাখ্যা আজ আর দিতে পারি নে। আমার সঙ্গে যে দু'জন বন্ধু গিয়েছিল, তাদের একজনের নাম গৌর ঘোষ (সাংবাদিক-সাহিত্যিক নন), আর একজনের নাম সুবল ঘোষ। আমি আর গৌর তখন কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য। সুবল একজন একনিষ্ঠ পার্টির সমর্থক। পার্টি দেশ বিভাগ মেনে নেওয়া সত্ত্বেও, আমরা কেন পারিনি? আমি না হয় পূর্ববঙ্গের সন্তান ছিলুম। গৌর-সুবল একান্তভাবেই পশ্চিমবঙ্গের সন্তান। দেশবিভাগকে সমর্থন করতে পারিনি বলেই আমাদের বা আমার মনে বিশেষ করে গান্ধীজীই ছিলেন সর্বাপেক্ষা বড় আশ্রয়।" (সমরেশ বসু, ১৯৮৭ : ৩৫)
>
> ২ "...আমার আনেক দিনের ইচ্ছা, একটি উপন্যাস লেখার। ঘটনাটি বাস্তব। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট সন্ধ্যা বেলা North Bengal Express-এ আমি ও দুজন বন্ধু, পশ্চিমবঙ্গ-নৈহাটি থেকে পূর্ব পাকিস্তান দর্শনে গিয়েছিলাম। আনন্দের মধ্যেও বড় বিষাদময় সেই অভিজ্ঞতা। আমরা রংপুর থেকে সৈয়দপুর এক অবাঙালী বিহারী দম্পতির অতিথি হতে বাধ্য হয়েছিলাম। বিহারী ভদ্রলোক সৈয়দপুর রেল কারখানায় চাকরি করতো — নতুন ভারতে নতুন চাকরিতে যোগ দেবার উদ্যোগপর্ব চলছিল। সেখানে দেখা পাই এক উদ্ধত যৌবনা নষ্ট নারীর — যার বাঁ হাতটি মণিবন্ধ থেকে কাটা। তাকে নিয়ে হিন্দু মুসলমান সকলেরই দুরন্ত লোভ। মেয়েটি নট সেটেলমেন্টে থাকে — তার বাইরে আসার অনুমতি ছিল।
>
> সেই অতীতের যাত্রা আজ কোথায় এনে দাঁড় করিয়েছে ২৩ বছরের সেই দিনের তরুণকে? (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮ : ৪০)

উল্লেখিত উদ্ধৃতি অনুসারে স্বয়ং সমরেশ বসু, গৌর ঘোষ ও সুবল ঘোষ *খণ্ডিতা*য় যথাক্রমে সতু, বিজু ও গোরায় রূপান্তরিত হয়েছেন। সেখানে কাজ করেছে

ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতাকে দর্শনে, বোধে-আবেগে, রূপবন্ধে রূপান্তরের সংযমচর্চিত শিল্পিত দক্ষতা।

সমরেশ বসুর ঔপন্যাসিক দৃষ্টিবোধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো — চরিত্রের ব্যক্তিত্ব, মনোভাব, দৃষ্টিকোণ, জীবনদর্শন তথা সংবেদের কার্যকারণ হিসেবে ঐতিহ্য, পারিবারিক প্রতিবেশ, শিক্ষা, বিবেচনাবোধের অভিমুখকে স্পষ্ট করা। এ কারণেই সাহিত্য-শিল্প-রাজনীতি ও সংস্কৃতি সম্পর্কে — সতু, বিজু ও গোরার স্বাতন্ত্র্য, শিক্ষা, অভিরুচি, ইতিহাস-ধারণাকে লেখক চিহ্নিত করেছেন, তাদের স্বতন্ত্র পারিবারিক ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষণীতে উপস্থাপন করে।

বিজুর ভালো নাম সৌরীন্দ্রনাথ মিত্র। বিদ্বান মেধাবী ছেলে, নীহাররঞ্জন রায়ের ছাত্র, প্রাচীন ইতিহাসে এম-এ ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া। উচ্চতর গবেষণার প্রস্তুতি নিচ্ছে। ধনী পিতা শচীন্দ্রনাথ মিত্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে, তবে শালীন ও নিরহংকার। বাবাকে শ্রদ্ধা করে, কিন্তু বাবার সব নির্দেশ মেনে চলতে পারে না। শচীন্দ্রনাথ মিত্র অত্যন্ত সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিকতা-আক্রান্ত মানুষ। পুত্র বিজুর সঙ্গেও প্রতিদিন কথা হয় না। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত না থাকলেও বিজুর কমিউনিস্ট পার্টির দিকে ঝোঁক আছে। সতু এবং গোরার সঙ্গে তিনি কখনও কথা বলেন না। বিজুর মা নিজেও রক্ষণশীল। তবে মায়ের ব্যক্তিত্বের কাছে পিতা শচীন্দ্রনাথের 'ফিউডাল মেজাজ' মাথা তুলতে পারে না। বিজুর বিরুদ্ধে শচীন্দ্রনাথ কোনো আপত্তি বা অভিযোগ আনলে বিজুর মা সেসব প্রশ্রয় দেন না। মায়ের স্নেহ-মমতার আশ্রয়-প্রশ্রয়েই বিজুর বন্ধু, সতু ও গোরা তাদের গৃহে প্রবেশ করতে পারে। বিজুর পরে ওর এক বোন ও ভাই আছে। দক্ষিণের বাদা অঞ্চলের জমিদারিতে বিজুর কাকা-জ্যাঠারও ভাগ আছে। পাশাপাশি মিত্তিরদের বড়ো বড়ো বাড়ি নিয়ে বিরাট একটা অংশ ছড়িয়ে আছে।

> গোরার বাবা হরেন্দ্রনাথ ঘোষ চটকলের 'নাম-করা মিস্তিরি ছিলেন'। 'গোরার বাবা এক সময়ে ভালো আয় করেছেন। জাত ব্যবসা বলতে যা বোঝায়, সেটা তিন-চার পুরুষ আগেই শেষ হয়েছিল। চটকলই সম্ভবত তার মূলে।' সমস্ত কারখানার যাবতীয় বিগড়ে যাওয়া মেশিনকে সারিয়ে তোলা ছিল তাঁরই কাজ। "অন্যান্য চটকল কোম্পানির কারখানার কর্তৃপক্ষ, প্রয়োজনে হরেন্দ্রনাথ ঘোষকে ধার চাইতেন। যান্ত্রিক গোলযোগ আর সংকটকে তিনি অনায়াসে কবজা করতেন। কিন্তু সকলেই অবাক আর মুগ্ধ হত" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬২৯-৩০)। গোরার দাদাও প্রথমে স্কুলে পড়া আরম্ভ করলেও, শেষ পর্যন্ত চটকলে 'মিস্তিরি বয়' হয়ে কাজে লেগেছিল। অল্প বয়সেই গুরুদাসের কাজের পদ্ধতি দেখে কোম্পানি কর্তৃপক্ষ তাকে ডান্ডিতে নিজেদের কারখানায় কাজ শিখতে পাঠিয়েছিল। গোরার দাদা গুরুদাস ঘোষ এ শহরের প্রথম বিলাত ফেরত। গোরার দাদা গুরুদাস স্কটল্যান্ডের ডান্ডি ঘুরে এসেছেন। এখন তিনি কারখানার চিফ মেকানিকাল অফিসার। 'গারার ঠাকুর্দাই প্রথম সামান্য বাস্তুভিটার চালাঘরের পরিবর্তে, একটা পাকা ঘর তুলেছিলেন। গোরার বাবা তাঁর আমলেই, একটি পাকা ঘরকে কেন্দ্র করে দোতলা ছোট বাড়ি করেছিলেন। গোরার দাদা বাড়ির সামনেই, এক গরীব ব্রাহ্মণ পরিবারের মস্ত

> বাগান আর জমিসহ বাড়ির অর্ধেক কিনে রেখেছেন।
> গোরাদের পরিবারে, ও প্রথম বংশধর, যে চটকলে যায়নি। বাংলায় এম এ পাশ করেছে। ভাল ফল করতে পারেনি বলে, আবার ইংরেজিতে এম এ করার কথা ভাবছে। আপাতত তিনটে টুইশানি ওর ভরসা। ...নেশার মধ্যে বিড়ি। কখনও কখনও সিগারেট। চায়ের দোকানে আড্ডায় চা। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৩০)
> বিশেষ কোনও রাজনৈতিক আদর্শের ওপর ওর তেমন আকর্ষণ বা আগ্রহ দেখা যায় না। তবে গত বছরের শুরুতে, কমিউনিস্টদের ঠ্যাঙানো দলেই ছিল। পরে সেটা কেটে গিয়েছে। সেই মনোভাব আর নেই। তবে নেতাজি সম্পর্কে এখনও দুর্বল। গান্ধীর ওপর আগে যতটা বিরূপ ছিল, এখন ততটা নেই। শরৎ বসুর প্রতি আকর্ষণ আছে। তাঁর দলে ও নেই। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৩০)

সত্যেশ চট্টোপাধ্যায় সতু এই শহরেরই এক পড়ন্ত চাটুয্যে পরিবারের ছেলে।

> পড়ন্ড়— এই কারণে, একদা এ পরিবারকে লোকে জমিদার বলে জানত। গঙ্গার ধারে, চাটুজ্যে পাড়ায়, পুরনো ধ্বংসপ্রাপ্ত চাটুজ্যেদের বিরাট গৃহের স্তূপ আর পোড়ো ভূমি দেখলেই বোঝা যায়। ...একদা যে পরিবারের নানা স্থানে ছিল বিস্তর ভূসম্পত্তি, প্রভূত আয়, সম্পদ ও শ্রী, এখন তার কিছুই অবশিষ্ট নেই। প্রাচীন ধ্বংসাবশেষে, এখনও মাথা গোঁজবার মতো যে-টুকু আস্ত আছে, সেখানে কেউ আস্তানা নিয়েছে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৩১)

'সতু এমনই একটি পরিবারের সন্তান। বাবা মারা গিয়েছেন অনেক আগেই। ওর চার দাদা এক দিদি, এক বোন। দাদারা সকলেই চাকুরিজীবী। সকলেই বিবাহিত এবং আলাদা। সতু কোনোকালেই দাদাদের বাধ্য ছিল না। বরাবরই কিছুটা বাঁধন-ছাড়া গোছের। কোনো রকমে, এড়িয়ে গড়িয়ে ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। ওর স্বাধীনচেতা আচরণকে মনে করা হত স্বেচ্ছাচারিতা। অতএব, উপেক্ষা অনাদর ছিল অনিবার্য। সংসারে মায়ের উদ্বিগ্ন স্নেহ ভালবাসা ওকে আগলে রাখার চেষ্টা করেছে। সতু মাকে বুঝত। কিন্তু মায়ের অবশিষ্ট জীবনকে নিশ্চিত নিরাপত্তার মধ্যে রেখেই, ও ওর পথে এগিয়ে গিয়েছে। ওর মধ্যে কোনোরকম বেপরোয়া ঔদ্ধত্য নেই। ও হলো, বৈষ্ণব কাব্যের 'নওলকিশোর'। বাল্যেই যার প্রেমের স্ফুটন ঘটেছে। স্কুলের বিদ্যাটাকে বরাবরই নীরস মনে হয়েছে। অথচ আরেক দিকে কাব্য-সাহিত্যের গ্রন্থকীট সৃষ্টির প্রেরণা ওর অন্তরে। এবং ধ্যানধারণায় রোমান্টিক। পরিশ্রমী। এ শহরেরই এক কায়স্থ পরিবারের মেয়ে প্রতিমা ছিল ওর প্রেমিকা। ঘটনাটি তিন বছর আগের, এ শহরে দুঃসাহসিক। কারণ, সতু প্রতিমাকে বিয়ে করেছিল। প্রতিমার বাড়ির সমর্থন ছিল না। বিরোধিতা থানা অবধি গড়িয়েছিল। প্রতিমা তখন ষোলো অতিক্রান্ত। অতএব, পুলিশ আইন, কোনও কিছুই বাধা দিতে পারেনি। এখন সতু এক সন্তানের জনক। আমেরিকানদের তৈরি, যুদ্ধের সময় এক কারখানা এখন আধা-ইঞ্জিনিয়ারিং টুলস ফ্যাক্টরি, সেখানে সামান্য কেরানির চাকরি করে।

সতু কমিউনিস্ট-নীতির সমর্থক; পার্টির পক্ষে নিজের কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা সতু কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য না হলেও একজন 'সিমপ্যাথাইজার'।

প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত না হয়েও স্বশিক্ষায় সুশিক্ষিত সত্যেশ চট্টোপাধ্যায়। তেইশ বছর বয়সী এ তরুণ ডজনখানেক কবিতা প্রকাশের অব্যবহিত পরেই সমকালীন অন্যতম শ্রেষ্ঠ তরুণ কবি, জাত কবি হিসেবে বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিদের প্রশংসা পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসু এ তরুণ কবির মাঝে "বিরাট সম্ভাবনা আর প্রতিশ্রুতি" দেখতে পেয়েছিলেন।

ঔপন্যাসিক প্রতিপাদ্যের প্রমাণে এসে মন্তব্য করেছেন, 'তিন বন্ধুর মধ্যে, আপাতদৃষ্টিতে, পারিবারিক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদির মধ্যে অমিল অনেক। তথাপি, তিনজনের মধ্যে বন্ধুত্বে, সেই অমিলগুলো কোনও বিরোধ সৃষ্টি করতে পারেনি।' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৩১-৩২)

খণ্ডিতা উপন্যাসের শুরু উনিশশো সাতচল্লিশ খ্রিষ্টাব্দের চোদ্দই আগস্টের বিকেলে। কলকাতা থেকে কুড়ি মাইল দূরে উত্তর চব্বিশ-পরগনার শিল্পাঞ্চল। একদিকে গঙ্গা, আর একদিকে রেললাইন, প্রায় সমান্তরাল। মাঝখানের ভূমিখণ্ডের শিল্পাঞ্চল ঘিরে সমগ্র ভারতের শ্রমিক আর গরিবদের বিশাল মহল্লার বস্তি। এমনি পারিপার্শ্বিক পটভূমিকায় বিজুদের দোতলা বাড়ির ছাদে বিজু আর সতু পশ্চিমের আলসেয় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পশ্চিমাকাশের ন্যারেটিভ চিত্ররূপময় ও দূরসঞ্চারক্ষম :

> সূর্য এখন জামরুল গাছের আড়ালে। ঝাড়ালো জামরুল গাছের ফাঁকে ফাঁকে, মাঝে মাঝে রোদ উঁকি দিচ্ছে। আকাশে মেঘ। মেঘলাভাঙা আকাশের রোদ বলতে যা বোঝায়, সে রকম না। বড় বড় চাংড়ার মেঘ। মাঝেমাঝে সেই চাংড়ার বুকে ফাটল ধরছে। সেই ফাটলের ফাঁকে সূর্যকে দেখা যাচ্ছে। আর চাংড়া মেঘের ফাটলের ধারে ধারে লাল রঙের ছটা লেগে আছে। মেঘের রং যেখানে হালকা, সেখানেও লাল ছোপ লাগছে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬১৯)

সমকালীন জটিল-কুটিল রাজনীতিতত্ত্ব ও দেশভাগের বিষাদময় বিপর্যয় সম্পর্কিত, বিজু-সতু এবং গোরার বহুকৌণিক ও তির্যক আলোচনা ও বেদনার সমান্তরালে উপরিধৃত নিসর্গচিত্রের পরিবর্তন, ঘনায়মান অন্ধকারের ইঙ্গিত প্রণিধানযোগ্য :

> পশ্চিমে আকাশটার চাংড়া মেঘের বিরাট ফাটলে সূর্য উঁকি দিচ্ছে। এখন সূর্য আরও খানিকটা নীচের ঢালুতে গড়িয়ে গিয়েছে। আর সারা আকাশে যেন ফাটলের ভিতর থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬২১)

ওদের আলোচনায়, সাম্প্রদায়িকতার নির্মম পরিণতি হিসেবে দেশভাগ সম্পর্কে যখন বল্লভ ভাই প্যাটেল, এম. কে. গান্ধী, জওহরলাল নেহেরু, নাজিমুদ্দিন, এ. কে. ফজলুল হকের অবস্থান বিশ্লেষিত হচ্ছিল তখনকার বর্ণনা প্রতীকাশ্রয়ী হয়ে ওঠে :

> পশ্চিম আকাশে মেঘের চাংড়াগুলো ক্রমেই ফাটলে ফাটলে ছিন্নভিন্ন হচ্ছিল। সূর্য আরও খানিকটা পশ্চিমে ঢলেছে। মেঘের ঘনত্ব কেটে যাচ্ছিল। আকাশ ক্রমাগত যেন আগুনের আভায় লাল হয়ে উঠছিল। পাহাড়ের ঢল নামা গঙ্গার গাঢ় গেরুয়া জলে রক্তের বান ডেকেছে। গঙ্গার বুকে, নৌকোর পাল, মাঝিদের গায়েও পড়েছে লাল রেখা। সামনের জামরুলের পাতায় রক্তাভা, ফাঁকে ফাঁকে লাল রোদ, সতু আর বিজুর মুখেও। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬২৪)

দেশব্যবচ্ছেদ, ভাগ বাটোয়ারা, কোন এলাকা কোথায় যুক্ত হবে, কোন অঙ্গ কর্তিত হবে, সতু-বিজু-গোরাদের বিচলিত-বেদনার পরিপ্রেক্ষিতে, বিজুর ছোটবোন কাঞ্চনা মণি, খুলনা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সংবাদে বিষণ্ন। তার মামার বাড়ি খুলনায়। সব বিষণ্নতা ঝেড়ে ফেলে স্বদেশভূমির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে মণিসহ তাদের প্রত্যেকের কণ্ঠে বেজে ওঠে গান :

> ধনধান্য পুষ্পে ভরা,
> আমাদের এই বসুন্ধরা,
> তাহার মাঝে আছে দেশ এক
> সকল দেশের সেরা... (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৩৮)

তখন সমরেশ বসু পশ্চিমাকাশের স্কেচ আঁকেন সমান্তরাল শব্দচিত্রে :

> পশ্চিম আকাশের গাঢ় বর্ণের গাছপালার মাথায়, সূর্যের শেষ রশ্মি শেষ বারের মতো যেন সব কালিমা পুড়িয়ে দিয়েছে। অতি উজ্জ্বল লাল সূর্য পরিপূর্ণ হয়ে ধীরে ধীরে ডুবছে। গঙ্গার গৈরিক জলে যেন রক্তের স্রোত। রক্তাভা ছাদের সকলের মুখে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৩৮)

খণ্ডিত ভারতের স্বাধীনতা-সূর্যের উদয়, অন্যদিকে প্রকৃতির সূর্যাস্ত, পরস্পরিত সন্নিকর্ষের বুনট — সমগ্র উপন্যাসের বোধ এবং সংবেদ এখানে অভিব্যঞ্জিত ও সংকেতিত হয়েছে।

দীর্ঘ দুশো বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পর ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে চলেছে। খণ্ডিত ভারতের এই 'অমূল্য স্বাধীনতা'-র আনন্দ-উৎসবের প্রস্তুতি সর্বত্রই প্রায় সম্পন্ন। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট বিকেলে কলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরে উত্তর চব্বিশ-পরগনার শিল্পাঞ্চলের বাঙালি পল্লির তিন তরুণ বন্ধু — সতু, বিজু, গোরা এ উৎসবের অংশী হতে পারেনি। ভারত বিভাগের অনিবার্য প্রতিক্রিয়ায় বাংলা তথা দেশ ভাগের ফলে তাদের যে বিচ্ছিন্নতা ও বেদনাবোধ তা থেকেই খণ্ডিত দেশমাতৃকার অপর অংশ পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনোভাবকে ও প্রতিক্রিয়া জানতে পরের দিন ১৫ আগস্ট রাতে ট্রেনযোগে তারা যাত্রা করেছে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বিভক্ত নবগঠিত পূর্ব পাকিস্তানকে যারা পৃথক দেশ হিসেবে ভাবতে চায়নি এ তিন তরুণ তাদেরই প্রতিনিধি।

সমরেশ বসু তিন তরুণের ভাবনা, সংলাপ ও পরস্পর কথোপকথনের মধ্য দিয়ে দেশবিভাগের রাজনৈতিক পটভূমি অনুসন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন। ১৪ আগস্ট

বিকেলবেলা পর্যন্তও তাদের কাছে স্পষ্ট ছিল না পাকিস্তান ও ভারতের অংশে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা কীভাবে বিভক্ত হচ্ছে। সে বিষয়টি এ উপন্যাসে ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

সুদীর্ঘ পরাধীনতার অবসানে প্রাপ্ত স্বাধীনতার আনন্দে উদ্বেলিত সবাই। স্বাধীনতার আগমনবার্তায় উচ্ছ্বসিত স্বাধীনতাকামী মানুষের ১৪ আগস্টের অপরাহ্ণ থেকে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের আনন্দ আয়োজনের প্রস্তুতির বিবরণ দিয়ে সর্বজ্ঞদৃষ্টির ঔপন্যাসিক *খণ্ডিতার* ন্যারেটিভের সূত্রপাত করেছেন :

> দুশো বছরের পরাধীনতার পর, এই অমূল্য স্বাধীনতা। অনেক ত্যাগ, দুঃখ, কষ্ট, অপমান, হত্যা, আর রক্তের বিনিময়ে, ভারত আগামীকাল স্বাধীন হবে। আগামীকাল ভারতের ঐতিহাসিক দিন। কেবল আনন্দের দিন না। অতীতের কথা মনে করেই যে কেবল অনেকে কোলাকুলি করে চোখের জলে ভাসছে, তাও পুরোটা ঠিক না। আসলে আনন্দের উচ্ছ্বাসেই অনেকে চোখের জল সামলাতে পারছে না। স্বাধীনতা। আজাদি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের অবসান। মাঝে মাঝেই, রাজনৈতিক দলগুলো, মাইকে আগামীকালের ভোরবেলা থেকে শুরু অনুষ্ঠান পর্বের ঘোষণার সঙ্গে, ঐ সব কথাগুলোও বলছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে এখনও ধিক্কার দেওয়া হচ্ছে। দেশের নেতাদের দীর্ঘ কারাবাসের কথা বলছে। অগণিত মানুষের ত্যাগ, হত্যা, রক্তপাতের কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছে। ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেওয়া শহীদদের নাম উচ্চারিত হচ্ছে। তবু, দেশ স্বাধীন হচ্ছে আগামীকাল। সেই আনন্দ আর উল্লাস চাপা থাকছে না। বরং একটা পাগলা খুশির উচ্ছ্বাসই বেশি। আর সেই সঙ্গে নানান প্রস্তুতি। ঘরে বাইরে। দোকানে বাজারে হাটে। কারখানা এলাকার বস্তিতে বস্তিতে, কোম্পানির লাইনে। বাঙালি মধ্যবিত্তদের বাড়িতে বাড়িতে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬১৮)

স্বাধীনতা প্রাপ্তির এ আনন্দ আয়োজনের প্রস্তুতি বিজুদের বাড়ির ছাদ থেকে দেখছিল সতু ও বিজু। ওদের কথোপকথন থেকেই জানা যায়, বাংলাভাগ নিয়ে জনমনে কতটা অস্বচ্ছতা ছিল। দার্জিলিংয়ে গভর্নর ক্যাসির সঙ্গে সোহরাওয়ার্দীর সাক্ষাৎ, চব্বিশ পরগনার বারাকপুর বারাসত ভাঙড় বসিরহাট পূর্ব বাংলার মধ্যে রাখার পক্ষে ক্যাসির আশ্বাসের কথা স্থানীয় কমিউনিস্ট নেতা তারক ভট্টাচার্যের কাছ থেকেই জানতে পায় গোরা। কিন্তু সংবাদপত্রে ভিন্নভাবে আসে ক্যাসির কথা, যেখানে কলকাতা ও দার্জিলিংকে দু বাংলার 'কমন সিটি' হিসেবে ঘোষণার কথা জানানো হয়। শুধু 'ইত্তেহাদ' পত্রিকা বিশ্বস্ত সূত্রের বরাত দিয়ে সোহরাওয়ার্দীকে দেয়া ক্যাসির আশ্বাসের কথা প্রকাশ করে, যা পড়ে গোরা তার কান্না থামাতে পারেনি। ছেচল্লিশের দাঙ্গা, ডাইরেক্ট অ্যাক্‌শন বা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক, মুসলিম লিগের 'কিপ ক্যালকাটা' আন্দোলন, গভর্নর ক্যাসি, হার্বার্ট, সিরিল র‍্যাডক্লিফের মতো ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিভেদনীতি। তৎকালীন কংগ্রেস নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শরৎ বসু, মুসলিম লিগ নেতা জিন্নার দ্বিজাতিতত্ত্ব, সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক, নাজিমুদ্দিনের কূটনৈতিক কার্যকলাপ, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ, শরৎ-সোহরাওয়ার্দীর 'সভারেন বেঙ্গল'-এর প্রতি

সমর্থন, এটি 'ইংরেজদের মাথা থেকে গজানো একটা চাল' বলে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সন্দেহ, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নিয়ে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ ঐক্যের পরেই জওহরলাল নেহরুর ভিন্ন কথা; এবং সার্বভৌমের বিপরীতে জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসের ডাক, ক্যাবিনেট মিশন, বড়লাট ও ইংরেজ সরকারের ভূমিকা, 'আজাদ', 'স্টার অব ইন্ডিয়া', 'মর্নিং নিউজ', 'ইত্তেহাদ'সহ সব মুসলিম লিগ পত্রিকার সংবাদসমূহ নিরাসক্ত ও নির্মোহ দৃষ্টি দিয়ে তিন বন্ধু বিচার-বিশ্লেষণ করে।

ফজলুল হকের মতো নন-কমিউনাল 'বিজ্ঞ বাঙালি নেতা'-র প্রতি সতুর আকর্ষণ ছিল। কাজেই 'কলকাতার মুসলমানদের কাছে নিজের ইমেজ বজায়' রাখার জন্য সোহরাওয়ার্দী দাবি জানালেও যেখানে 'মেজরিটি মাইনরিটির ভিত্তিতে দেশভাগ করার কথা হচ্ছিল সেখানে' ফজলুল হকের হিন্দুপ্রধান কলকাতার দাবি সতু মানতে পারেনি। অন্যদিকে বিজু সোহরাওয়ার্দীকে সমর্থন জানিয়ে বাঙালিদের প্রতি কথাবার্তায় অধিক আবেগময়তার কারণে শেরে-ই-বাংলা ফজলুল হকের সমালোচনা করেছে। কারণ মুখ্যমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় থেকেও তিনি বিয়াল্লিশের বন্দিমুক্তির বিষয়ে কোনো কথা বলেননি। কিন্তু সতু রাজনৈতিক দূরদর্শিতা দিয়ে সুগভীর পর্যবেক্ষণে মুক্তমনে ফজলুল হকের এ সীমাবদ্ধতাকে মেনে নিয়েও তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলিকে অস্বীকার করেনি। বিজুর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে তার কথোপকথন নিচের অংশে প্রকাশিত হয়েছে :

> দ্যাখ বিজু, মনের মধ্যে অবিশ্বাস নিয়ে তর্ক চলে না।" সতু মুখ ফিরিয়ে তাকালো গঙ্গার দিকে, "একটা লোককে ছোট করার জন্য, তাঁর অনেক খুঁত খুঁজে খুঁজে বের করা চলে। যাঁর কথাবার্তায় প্রাণের দরদ থাকে, তাঁকে নাটুকে মনে হয়। তাঁর কথাবার্তায় মেলোড্রামার সুর। আমি এর মধ্যেই একটা ব্যাপার বুঝে গেছি। সেটা হলো ক্ষমতা। তা তিনি বাড়ির কর্তাই হোন, সমাজপতিই হোন, আর রাষ্ট্রের কর্ণধারই হোন, ক্ষমতা জিনিসটার মধ্যে একটা কড়া নেশা অছে। ফজলুল হক সেই নেশা থেকে একেবারে মুক্ত ছিলেন, তা বলছিনে। কিন্তু সাঁইত্রিশ-আটত্রিশে বন্দীমুক্তির জন্য যখন গান্ধী চেষ্টা করছিলেন, হকসাহেব বিধানসভায় অকপটে বন্দীদের মুক্তি দেবার কথা অ্যানাউন্স করেননি? (সমরেশ, ২০০৯ : ৬২২)

ফজলুল হকের এ গুণাবলির জন্যই সর্ব সাধারণের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা অনেক বেশি ছিল। এটাকে কাজে লাগানোর জন্য হার্বার্ট সোহরাওয়ার্দী ও নাজিমুদ্দিনের পরিবর্তে তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করেছিলেন। পরে জাপানি বাহিনী ভারতের দিকে অগ্রসর হতে থাকলে হার্বার্ট ইংরেজবিদ্বেষ দূর করার অভিপ্রায়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের মাঝে বিভেদ সৃষ্টির জন্য ফজলুল হককে সরিয়ে 'চিফ অ্যান্ড হোম মিনিস্টার'-এর দায়িত্ব দিলেন নাজিমুদ্দিনকে। বন্দিমুক্তির বিষয়টি নাকচ করার কৌশল হিসেবে নাজিমুদ্দিন ছুটিতে গেলে ভারপ্রাপ্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজয়প্রসাদের উদাসীনতার সুযোগে পোর্টার নামে এক ইংরেজ অফিসার হার্বার্টকে দিয়ে সফলভাবে এটি করিয়ে নেয়।

এরপর হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৪৬ সালে মুখ্যমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর হস্তক্ষেপে বন্দিমুক্তি অনেকটাই সম্পন্ন হয় যাতে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বন্দিরাও মুক্তি পায়। এ সম্পর্কসূত্রেই কমিউনিস্টদের সঙ্গে সোহরাওয়ার্দী সুসম্পর্ক তৈরি হয়।

সতুর বিশ্লেষণে সোহরাওয়ার্দীর ভ্রান্তি অন্যত্র। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের দাবিতে জিন্নার শান্তিপূর্ণ 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন'-এর বিপরীতে কলকাতার মুসলমানদের উদ্দেশে নাজিমুদ্দিন ঘোষণা দেয় : "আমাদের জেহাদ সরকারের বিরুদ্ধে নয়। হিন্দুদের বিরুদ্ধে" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬২৩)। ঠিক সে মুহূর্তে ব্রিটিশ কূটনীতির ফাঁদে পা দিয়ে সোহরাওয়ার্দী সরকারি কর্মচারীদের নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসে সমস্ত সরকারি অফিস বন্ধ রাখার ঘোষণা দিয়ে হিন্দুদেরকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে নিয়ে গেলেন। ওই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্ট হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গায় প্রমাণ হয়ে যায় হিন্দু-মুসলমান আলাদা হয়ে যাওয়ার অনিবার্যতা।

পরে অবশ্য সোহরাওয়ার্দী নিজের ভুল বুঝতে পেরে হিন্দু-মুসলিম সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য নাজিমুদ্দিনকে কেন্দ্র করে প্রফুল্ল ঘোষের সঙ্গে যুক্ত বিবৃতি দিয়েছেন। নিজের অনুতাপবিদ্ধ হৃদয়ের শান্তি প্রার্থনা ও কলকাতায় মুসলমানদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবার জন্য গান্ধীজিকে কলকাতায় রাখার জন্য বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে পর্যন্ত গিয়েছেন। এমনকি তাঁর সঙ্গে অনশনে যোগ দিতেও চেয়েছেন। কিন্তু এ দু জনের অনশনের কারণ ভিন্ন ছিল। আবেগজড়িত কণ্ঠে বিজুর উদ্দেশে সতুর উচ্চারণ :

> ...মাত্র গতকালের কাগজে প্রথম আমরা বাউন্ডারি কমিশনের ঘোষণা জেনেছি, কলকাতা, চব্বিশ পরগনা, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি জেলা পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পড়েছে। অথচ এখনো ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে মালদা, নদিয়া, দিনাজপুরকে। এখনো আমরা মুর্শিদাবাদ সম্পর্কে কিছুই জানিনে। সুরাবর্দি এখন কোন ম্যাজিকে বুঝতে পারছেন, কিপ ক্যালকাটা একটা ধাপ্পা? অথচ বুঝতে ওঁকে হচ্ছেই। আজও কলকাতার অবস্থা কী? বিহারের মুসলমানদের কলকাতা থেকে বিহারে ফেরত পাঠানো হচ্ছে। তারা সুরাবর্দি সাহেবকে আশীর্বাদ করছে? ক্যানাল ওয়েস্ট রোড থেকে যে শত শত আতুর মুসলমানদের স্পেশাল ট্রেনে পূর্ববঙ্গে পাঠানো হচ্ছে, তাদের চোয়াল কি নরম হচ্ছে? কলকাতায় আজও সান্ধ্য আইন। সকলেই ভেবেছিল, আগামীকাল তা তুলে নেওয়া হবেই। হয়নি। বরং সান্ধ্য আইনের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আর আগামীকাল ভারত স্বাধীন হচ্ছে! আজ সুরাবর্দি সাহেবের গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। গান্ধীজিকে কলকাতায় রাখবার জন্য, কমিউনিস্ট থেকে শুরু করে সব দলের নেতাদের কাছে ছুটছেন। নিজে দৌড়চ্ছেন কেন? ভাবা যায়, তিন দিন আগেও এন্টালিতে তিনজন হিন্দু খুন হয়েছে? ভাবা যায়, দক্ষিণে ট্রেন থেকে নামিয়ে মুসলমানদের খুন করা হচ্ছে? আজ আপনার সদ্‌বুদ্ধি জাগ্রত হয়েছে। মহান নেতা! আজ আপনি ঘোষণা করছেন, আগামীকাল গান্ধীজির সঙ্গে অনশন করবেন। কিন্তু আপনার অনশন আর গান্ধীজির অনশনের কারণ কি এক? আপনি পাকিস্তান চেয়েছিলেন, পেয়েছেন। গান্ধীজি ভারত বিভাগ চাননি, তাই ভারতের এই দিনটি তাঁর কাছে চোখের জলের করুণ হাসি। অনশন দিয়ে, স্বাধীনতা দিবসকে গ্রহণ করছেন। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬২৫)

এখানেই গান্ধীজির সঙ্গে সতুর প্রাণের যোগ। এ কারণে সে মানসিক শান্তির জন্য একবার কলকাতার বেলেঘাটায় গিয়ে তাঁর পায়ে 'মাথা ছুঁইয়ে' আসতে চায়। 'কমিউনিস্ট পার্টির সিমপ্যাথাইজার, নীতির সমর্থক, পার্টির হয়ে নিজের কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করা' সতুর মুখে এ ধরনের কথা শুনে বিস্মিত বিজু বুঝতে পারে সতুর রক্তক্ষরণের প্রকৃত উৎস কোথায়। নীতি কিংবা আদর্শের চাইতে মানবতাকেই সে উর্ধ্বে স্থান দিয়েছিল। এ কারণেই প্রাত্যহিক জীবনবাস্তবতার অংশী হয়ে সমস্ত কর্তব্য পালনের মধ্যেও সতু হিন্দু-মুসলিম বিরোধ কিংবা দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারছে না বলেই তার বেদনাবোধের তীব্রতা এত বেশি। একমাত্র বিজুর কাছেই এ মুহূর্তে সেটা প্রকাশ করতে পেরেছে সতু :

> ঠিক, আমি কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক। কিন্তু নিজের কাছে, তোর কাছে, গোরার কাছে আমি মিথ্যে বলতে পারব না। হিন্দুস্থান পাকিস্তান তত্ত্বকে মানতে হয়েছে। অথচ আমার বুকের ভেতরটা ফেটে যাচ্ছে। স্বাধীনতার সমস্ত আনন্দের মধ্যে, ঐ এক জায়গায় অন্ধকার দলা পাকিয়ে রয়েছে। সেটা হিন্দু মুসলমান, দুইয়েরই পরাজয়। ওরা আমাদের খণ্ড করে, ভাগ না করে, এ দেশ ছাড়ল না। এখানে গান্ধীজি ছাড়া আমার আর কে আছেন? আমি জানি, তোদের কাছে এটা আজ অবাস্তব। কিন্তু বিজু, আমি নিরুপায়। বাড়িতে প্রতিমা তিন রঙের কাপড় কিনে এনে, ফ্ল্যাগ সেলাই করছে। কাল সকালে ঘুম থেকে উঠে আমার প্রথম কাজ, ঝাণ্ডা খাটানো। তুই আর গোরা যাবি। ঝাণ্ডা খাটিয়েই আমাকে মাংসের বাজারে লাইন দিতে যেতে হবে। যে-যত কথাই বলুক, কাল প্রথম স্বাধীনতা দিবস। সবাই ভাল-মন্দ খাবে। আমি বলছিনে, আমার আনন্দ হচ্ছে না। কিন্তু যে-লোকটা ভেতরে ভেতরে অসুখে ভোগে, তার কি আনন্দ হয় না? আমারো সেইরকমই হচ্ছে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬২৬)

বিজুর মনেও একই বিষাদ। সতুর কথা শুনে নিজের অনুভূতিও ব্যক্ত করে তাঁর কাছে :

> সতু, কোন কথা থেকে কোথায় চলে এলি। এইখানে তোর কাছে আমাদের হার। সুরাবর্দি তোর আসল কথা নয়। আসল কথাটা তোর আলাদা। সেখানে তোর সঙ্গে আমার কোনো তফাত নেই। দ্বিজাতিতত্ত্ব এতোকাল পরে আমাদের মেনে নিতে হলো, অঙ্গহানিটাও তাই অপরিহার্য করে তোলা হল। তুই কি ভাবছিস, আমার কষ্ট নেই? ইত্তেহাদে পড়েছিলাম, মুসলমানদিগের যাহাতে সুখ, হিন্দুদিগের তাহাতেই অসুখ। এমনকী যে বামপন্থী বন্ধুরা এতদিন দিনরাত গান্ধী-জিন্না মিলনের শ্লোগান দিয়া আকাশ-বাতাস মুখরিত করিতেছিলেন, তাঁহাদের মুখেও বিষাদের কালো ছায়া পড়িল। কথাটা উঠেছিল, গত মে মাসের ষোলো তারিখে, ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যান নিয়ে। কংগ্রেস লিগ, দু দলই প্ল্যান অ্যাকসেপ্ট করেছিল। তারকদার মনে আজ কী আছে, সুরেনবাবুই বা কী ভাবছেন, জানিনে। একমাত্র শরৎ বসু ছাড়া, কোনো হিন্দুকেই ইত্তেহাদ এখনো বোধহয় বিশ্বাস করছে না। কিন্তু দেশ-বিভাগ আমিই কি মেনে নিতে পারছি। আমি ইতিহাসের ছাত্র। আমি তোর কথা শুনে ভয় পাচ্ছি, সতু। আগামীকালের দিনটা যেন ভবিষ্যতের জন্য অশুভ না হয়। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬২৬)

সতু-বিজু এ বিরোধ-সংঘাতপূর্ণ সময়ে আসন্ন অশুভ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই

উদ্বিগ্ন হয়েছে। এভাবেই ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। একদিকে উগ্র সাম্প্রদায়িক চরিত্র যেমন তিনি এনেছেন অন্যদিকে অসাম্প্রদায়িক মুক্তমনা চরিত্রও এ উপন্যাসে ঘুরেফিরেই এসেছে।

কলকাতা জেলা মুসলিম লিগ নেতা মনসুর মল্লিক এমনই এক অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তি। যাঁর বংশপরম্পরার মধ্যদিয়ে সমরেশ বসু হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতির সম্পর্ক উদ্‌ঘাটন করেছেন। একজন সর্দার হিসেবে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসা তাঁর পিতামহ মোহাম্মদ রসুল মল্লিক প্রথমে কলকাতার বন্দরে আসেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় তিনি নিজের শ্রমিক দলকে নিয়ে চটকলে কাজ নেন। শ্রমিকদের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর ছিল এবং বাঙালিদের কাছেও তিনি অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি ছিলেন। কোম্পানির ইংরেজ সাহেবরাও তাকে সমীহ করত। এলাকার হিন্দুদের কাছেও তার এতটাই গ্রহণযোগ্যতা ছিল যে বাঙালি পল্লির হিন্দু এলাকায় যখন তিনি বসতবাড়ি নির্মাণ করেন, বেশির ভাগ হিন্দু বাঙালি কোনো প্রতিবাদ জানায়নি। রসুল মল্লিক নিজপুত্র মোহাম্মদ গোলাম রসুল মল্লিককে বি.এ. পাশ করিয়ে শিক্ষিত মুসলমান তৈরি করেছিলেন। তাঁর ছেলে মনসুর মল্লিক বাবার অপূর্ণ ইচ্ছা পূর্ণ করতে বি.এ. পাশ করে কলকাতায় আইন পড়েছিলেন। এরপর মুসলিম লিগের সদস্য হিসেবে যোগ দেন যখন ফজলুল হক ওই দলের সভ্য ছিলেন।

১৯৪৬ সাল থেকে গত এক বছর ঘটে যাওয়া ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণ করে তারা দেখেছে, জিন্নার প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকালীন উত্তপ্ত বাস্তবতায়ও তাদের অঞ্চলে শান্তি বজায় ছিল শুধু মনসুর মল্লিকের মতো ব্যক্তির জন্য। তার কর্মস্থল কলকাতার আলিপুর হলেও প্রতিদিনই পিতামহের বাস্তুভিটা থেকেই তিনি যাতায়াত করেন। বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্য জনসভায় শান্তি রক্ষার আহ্বান জানিয়ে মুসলিমদের উদ্দেশে তিনি বলেন :

> নাজিমুদ্দিন সাহেব সত্যি কথা বলেননি। আপনারা ভুলে যাবেন না, কংগ্রেসের নয়া প্রেসিডেন্টের একটা কথাকে কায়েদে আজম জিন্না সাহেব মেনে নিতে পারেননি। আমি মনে করি, কংগ্রেসের নয়া প্রেসিডেন্ট জওহরলালজিও উচিত কথা বলেননি। কংগ্রেস ক্যাবিনেট প্ল্যান মেনে নিয়েছে, তারপরেও উনি বললেন, তা বলে সার্বভৌম গণপরিষদ কংগ্রেসের মত মেনে চলতে বাধ্য নন। অথচ ষোলোই মে ক্যাবিনেট মিশন প্ল্যানে, এক সপ্তাহের মধ্যে কংগ্রেস আর মুসলিম লিগ এক মত হওয়াতে আমাদের সকলের মন আনন্দে নেচে উঠেছিল। আর দশই জুলাই, জওহরলালজি এরকম একটা কথা বললেন। জিন্না সাহেব গেলেন রেগে। কারণ, তিনিই জানতেন, এতে ক্যাবিনেট মিশন, বড়লাট আর ইংরাজ সরকার তামাশা দেখে মনে মনে হাসছে। জিন্না সাহেব ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। কিন্তু নাজিমুদ্দিন সাহেব কী বলছেন? তিনি মিথ্যা কথা বলছেন যে, কায়েদে আজমের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ভারত সরকারের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দুদের বিরুদ্ধে। আমি আপনাদের সামনে, একজন মুসলমান হয়ে বলতে লজ্জা পাচ্ছি, নাজিমুদ্দিন সাহেব ডাহা মিথ্যা কথা বলেছেন। তার ওপরে শহিদ সুরাবর্দি সাহেব পরশু ছুটির দিন ঘোষণা করেছেন। তাঁরা আগুন নিয়ে খেলা করতে যাচ্ছেন। আপনাদের আমি বলছি, পরশু এ

> অঞ্চলের সমস্ত হিন্দু-মুসলমান গুন্ডাদের আপনারা কিছুতেই এমন সুযোগ দেবেন না, যাতে কেয়ামত নেমে আসতে পারে। আপনারা মুসলমানরা, যাঁরা কাল প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করে, কারখানায় যেতে না চান, যাবেন না। কিন্তু হিন্দুদের বাধা দেবেন না। আমরা জান দেব, তবু হিন্দু-মুসলমান কাজিয়া মারামারি করব না।...(সমরেশ, ২০০৯ : ৬৩৫)

তর্ক-বিতর্ক-বিশ্লেষণ ও বিবেচনা থেকে *খণ্ডিতা*র আখ্যানাংশ মূলত গোরার সুধা বউদির বাসায় পারিবারিক-সামাজিক পরিস্থিতিতে স্থানান্তরিত হয়। এখানে পারিবারিক জীবন-সমস্যার সঙ্গে সমকালীন রাজনীতির অন্তর্বয়নের ফলে ঘটনাংশ প্রাণিত ও স্পন্দিত হয়েছে, পরিসরও হয়েছে প্রসারিত।

উপন্যাসের এ পরিসরে, সুধা বউদির বাসায়, গান্ধীপ্রসঙ্গ ঘুরেফিরেই এসেছে। মুর্শিদাবাদ, খুলনা নিয়ে আলোচনার সূত্রে এসেছে দেশবিভাগকালীন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী ও আপসকামী নেতাদের মধ্যে মুসলিম ব্যবসায়ী ও হিন্দু জমিদার কর্তৃক অর্থ হস্তান্তরের বিষয়। মনসুর মল্লিকের কাছ থেকেই গোরা জেনেছে, দেশবিভাগের চব্বিশ ঘণ্টাও বাকি নেই অথচ প্রেসিডেন্সি বিভাগ থেকে যেখানে একমাত্র খুলনাকেই পূর্ব পাকিস্তানে দেবার কথা ঘোষিত হয়েছিল সেখানে ভারতে খুলনাকে রাখার জন্য হিন্দু বড়লোক জমিদাররা কোটি কোটি টাকা খরচ করছে। সতু জানে খুলনার হিন্দু জমিদারদেরই শুধু টাকা আছে তা নয়, ইস্পাহানির মতো কলকাতার অবাঙালি মুসলমান ব্যবসায়ীদের হাতেও কম টাকা নেই। মনসুর মল্লিক ও সতু দুজনই এর পরিণাম কী হতে পারে এটা ভেবে বিশেষ করে 'কমিউনাল অশান্তি' নিয়ে উদ্বিগ্ন। কাজেই তাদের দুজনের কাছেই কলকাতায় গান্ধীর অবস্থানই একমাত্র আশা-ভরসার উৎস। এমনকি যে সুধাবউদি বিকৃতমস্তিষ্ক স্বামী প্রকাশ মুখুজ্জের অর্থলোভী কুৎসা রটনাকারী আত্মীয়দের সঙ্গে লড়াই করে বুদ্ধিকৌশলে একমাত্র সন্তান মানিককে নিয়ে সংসারজীবন যাপন করছেন তিনিও গান্ধীর দর্শনলাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। তিন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে স্বাধীনতার আনন্দ ভাগ করে নিতে চান সুধা বউদি। লেখাপড়ায় বেশিদূর অগ্রসর না হয়েও কিংবা রাজনীতি না বুঝলেও ছোটো বউদির দাদা সুহৃদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে তক্‌লিতে সুতো পাকাতে আর চরকা কাটতে শিখেছিলেন সুধা বউদি। পঞ্চাশ বছর বয়সী অবিবাহিত সুহৃদ চট্টোপাধ্যায় গান্ধী অন্তপ্রাণ। তার কাছ থেকেই সুধা বউদি যে কথা শুনেছিলেন তা তিনি এখনও বলেন : "...পৃথিবীতে বুদ্ধ যিশু দুজন করে জন্মান না। তেমনি গান্ধী একজনই এই পৃথিবীতে জন্মেছেন" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪১)। যুবতী বউ চান করে এক প্রস্থ কাপড়ে লজ্জা নিবারণ করতে অপারগ হলে নিজের গায়ের কাপড় স্রোতের জলে ভাসিয়ে দিয়ে তার লজ্জা রক্ষা করেন গান্ধী — সুহৃদদার কাছে শোনা এ গল্প শোনাতে গিয়ে সুধা বউদির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে আসে :

> আমি তো সামান্য একটা মেয়ে। সেই মেয়েটার অবস্থা বুঝি। অথচ আমরা কিছুই করি না। সুহৃদদার কাছে ঘটনাটা যখন শুনেছিলাম, তখন মনে হয়েছিল, তিনি অন্য রকম। পৃথিবীর যেসব বড় বড় নেতাদের কথা শুনি ড় লোকদের, তিনি তাঁদের থেকে আলাদা। সেই থেকে তাঁকে অনেকবার দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। কাগজে পড়ছি, সোদপুর থেকে গতকাল বেলেঘাটায় যাবার পরেই তাঁকে দর্শন করবার জন্য সবাই ভিড় করছে। কলকাতায় দাঙ্গা

থেমে গেছে ...আশ্চর্য! কে এমন আছেন? আর কে? (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪২)

গান্ধীকে দেখতে যাওয়া, তাঁর কথা শোনাও স্বাধীনতার আনন্দের মধ্যেই পড়ে বলে সুধা বউদি মনে করেন। সতুর বিশ্বাসও তাই : "কেউ নেই। আর একমাত্র লোক এই দেশে, যিনি দেশ-বিভাগ চান না। আমি আজই এক বার যাব — তাঁকে দেখব।" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪২)

অতঃপর কাহিনি বিন্যস্ত হয়েছে ট্রেনের কামরায়। নৈহাটি লোকাল ট্রেনে উঠতে গিয়ে ভুলক্রমে লালগোলা প্যাসেঞ্জারে উঠে পড়ে সতু, বিজু ও গোরা। সংলাপধর্মী পরিচর্যা-প্রকরণে ট্রেনের কামরার বাস্তবতা রূপান্বিত হয়েছে, আলোচনায় এসেছে দেশভাগ, রাজনীতি ও রাজনীতিকদের প্রসঙ্গ। আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কে কম্পার্টমেন্টের চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী খাকি হাফ প্যান্ট ও শাদা হাফ শার্ট পরিহিত সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক চরিত্র যেমন আছে, তেমনি আছে মধ্যবয়স্ক ধুতি পাঞ্জাবি পরা নদীয়া জেলা কংগ্রেসের নেতা অশ্বিনী হালদার। দেশভাগকে মন থেকে মানতে পারেননি বলে সপ্তাহখানেক আগে সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। দেশভাগের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বলতে গিয়ে তিনি জওহরলাল ও প্যাটেলকে 'মাউন্টব্যাটেনের দ্বারা দুটি সম্মোহিত আত্মা' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪৬) বলেও অভিযুক্ত করেন। তিনিও মানসিক শান্তির জন্য বেলেঘাটায় গান্ধীর কাছে যেতে চান। ট্রেনে বসে অশ্বিনী হালদারের কাছ থেকেই ওরা গান্ধী ও হায়দারি ম্যানসন সম্পর্কে জানতে পেরেছে : সোহরাওয়ার্দী গান্ধীকে সোদপুর থেকে বেলেঘাটায় হায়দারি ম্যানসনে নিয়ে গেলে সাম্প্রদায়িক হিন্দু তরুণ দল হিন্দুদের ওপর মুসলমানদের নির্যাতনের জন্য গান্ধীকে অভিযুক্ত করে "গো ব্যাক গান্ধীজি" শ্লোগান দিলেও তিনি তাদের অহিংসার বাণী দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। বিশেষ করে সতেরো আঠারো বছরের একটা ছেলে যখন বলে — "ইতিহাসে প্রমাণ করতে পারেনি, দুই ভিন্ন কমিউনিটি কোনওকালে বন্ধুত্ব করে পাশাপাশি বাস করেছে। আমি ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, হিন্দু-মুসলমান বরাবর লড়ে আসছে ..." (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪৫)। এর উত্তরে গান্ধী তাকে বলেন,

> ...তুমি আমার থেকে বয়স্ক নও। তুমি শোনোনি, হিন্দু ছেলে মুসলমানকে চাচা বলে ডাকছে। তুমি দেখোনি, হিন্দু মুসলমানরা তাদের উৎসব অনুষ্ঠান একসঙ্গে পালন করেছে — সামাজিক ভাবে। সে যাকগে, তোমরা চাও আমি এখান থেকে চলে যাই। কিন্তু এ রকম কোনও শক্তির কাছে আমি নত হতে শিখিনি। তোমরা আমাকে বন্দি করতে পারো, হত্যা করতে পারো, আমি মিলিটারি ডাকব না, কোনও সাহায্য চাইব না। তোমরা বলছ, আমি হিন্দুর শত্রু। কিন্তু আমার অন্তরের সত্য তাতে নষ্ট হয় না। কেমন করে আমি মানব, আমি হিন্দুর শত্রু? তোমরা আমাকে বোঝাতে পারলে, আমি এখান থেকে চলে যাব।
>
> ...তোমরা কেন বুঝতে পারছ না, একজন হিন্দু হয়ে, আমি নিজ সম্প্রদায়ের শত্রু হতে পারিনে। তোমরা মনের সংকীর্ণতায় ভুগছ। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪৬-৪৭)

শেয়ালদা স্টেশনে ভিড় নেই। ওরা তিনজন অতি দ্রুত বেগে দৌড়িয়ে হায়দারি ম্যানসনের সন্নিকটে পৌঁছায়। ওরা ভিতরে ছুটে যেতেই, কয়েকজন বাধা দেয়। সোহরাওয়ার্দী স্টিয়ারিং ধরে গাড়ি চালিয়ে গান্ধীজিকে লেকের ধারে নিয়ে যাচ্ছেন বিশ্রামের জন্য। সকলেই গান্ধীর জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। পেছনে ক্লান্ত, স্মিত মুখে বুকের কাছে দু হাত জোড় করে বসেছিলেন গান্ধী। তাঁর এ মূর্তি দেখে সতুর চোখ অশ্রুসজল হয়ে ওঠে :

> সতুর দুহাত ওর বুকের কাছে উঠে এল। ওর দৃঢ় বিশ্বাস, ও ভাববাদী না। ঈশ্বরে ওর বিশ্বাস নেই। জাতপাত তো মানেই না। গলার পইতা কবে ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছে। শ্রেণী বিপ্লবের প্রতি ওর বিশ্বাস। তবু এই মানুষটাকে দেখে, ওর চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে কেন? ও কি আত্মবিস্মৃত? অচেতন? নিজেকে চেনে না? (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪৭)

আশেপাশে তখন শোনা যাচ্ছে, পাঁচ হাজার হিন্দু, পাঁচ হাজার মুসলমানের মিলিত মিছিল নিয়ে আসছেন অরুণা আসফ আলি আর রামমনোহর লোহিয়া। বিজু গোরা বাসায় না-জানিয়েই চলে এসেছিল। সতু প্রতিমাকে রাতে ফিরে আসার কথা বলেছিল। তিন মূর্তিই সিগারেট খাচ্ছিল। গোরা হাঁটতে হাঁটতে বক্র মন্তব্য করে, "...জ্বালিয়ে দিয়ে ধরায় আগুন পালিয়ে গেছে চতুর ফাগুন। লাস্ট ইয়ারের ষোলোই আগস্টের দাঙ্গা ছিল, পাকিস্তানের দাবিকে অনিবার্য করে তোলা। পেছনে কারসাজি যাদেরই থাকুক, তারা আজ সাকসেসফুল। তারাই আজ সবথেকে খুশি।" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪৭)

রাত পৌনে দশটা পর্যন্ত কলকাতার পথে পথে গান্ধীজির জমায়েত দেখে, হায়দারি ম্যানসনে প্রবেশের ব্যর্থতা নিয়ে তিন বন্ধু ফিরে এসেছে শিয়ালদহ স্টেশনে। তাদের মন ছিল নিরানন্দ, ক্লিষ্ট। ওদের মনে পড়ছে — স্বাধীনতার দিনে গান্ধীর উপবাস যাপন, শক্তির ঊর্ধ্বে উঠে নব্য শাসকদের প্রতি 'বিশ্বস্ত, অহিংস, শান্ত ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন' হওয়ার এবং জনসাধারণকে ঐক্যচেতনায় উদ্বোধিত হয়ে 'গরল' ভুলে 'অমৃত' পানে উৎসাহিত করার জন্য গান্ধীর উদাত্ত আহ্বান।

শিয়ালদহ স্টেশনে এসে, সতু-বিজু-গোরা তাড়াহুড়ায় রানাঘাট লোকাল ট্রেনে উঠে পড়ে। ওদের কম্পার্টমেন্টে, থিয়েটারের বিখ্যাত অভিনেতা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সী নৈহাটির বিধু গাঙ্গুলির দেখা পায়। বিধু গাঙ্গুলি কেবল মদ্যপ নয়, মদ বিতরণেও উদার। ত্রিমূর্তিকেও মদ্য পানের জন্য আন্তরিক অনুরোধ করে। ওরা অপারগতা জ্ঞাপন করে। বিধু গাঙ্গুলি নতুন শাসকদের উদ্দেশে দুঃখ করে বলেন :

> '...একদিন-দুদিনের পরেই স্বাধীনতা তো নয়। দুশো বছরের পরাধীনতার পরে স্বাধীনতা। রাত পোহালেই। আর আপনারা নতুন শাসনকর্তা, দেশের লোক! এমন দিনেই মদের দোকান বন্ধ করার হুকুম দিলেন? আপনারাই বা খাবেন কী করে?'
> পাশের একজন মাথা নাড়ল, 'ওঁরা এ সব খান না।'
> আপনাকে এসে কানে কানে বলে গেছেন, না?' বিধুবাবু ধমকে উঠলেন, 'আমি কি গান্ধীজির কথা বলেছি? প্রফুল্লবাবুর কথা বলেছি? কেউ কেউ খান না, কেউ কেউ খান। দুশো বছরের পরাধীনতা কাটিয়ে, এমন দিনে মদ বন্ধ? ছি ছি ছি। খুব খারাপ। এর পরে

> হয়তো হুকুম জারি হবে, দেশে মদ খাওয়াই প্রহিবিটেড করে দেবে। তাতে কী হবে? লোকে চুরি করে খাবে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪৯)

আপাতদৃষ্টিতে, মদ্যপ অভিনেতা বিধুবাবু দেশভাগের যন্ত্রণায় কষ্টকাতর। পারিবারিক জীবনের পূর্ণতাও তার এ শূন্যতা ঘোচাতে পারেনি। সতু, বিজু ও গোরার কাছে বিধু গাঙ্গুলির এ সম্পর্কিত অসহায় স্বীকারোক্তি :

> ভালবাসার থেকে বড় কিছু নেই। দুগ্গাদা — মানে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ফরটিফাইভে ঢাকায় নাটক করতে গেছলাম। কী খাতির, কত ভালবাসা। কিন্তু কী হল? ভালবাসাবাসি থাকলে দেশ ভাগ হত? আর কোনও দিন ঢাকায় যাওয়া হবে না। আমি তো ওসব বুঝিনে — ওই যে সব রাজনীতিটীতি — ওখানে ভালবাসাবাসি নেই...নো, নো রেসপেক্ট। আমাকে একটু ভালবেসো... (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৪৯)

রাজনৈতিক জীবন রূপায়ণের ক্ষেত্রে *খণ্ডিতায়* মানুষের প্রেম-প্রীতি-মমতাময় পারিবারিক জীবনের ছবিও সমান গুরুত্ব পেয়েছে। তিন বন্ধু যখন পনেরোই আগস্টে স্বাধীনতা দিবসের আনন্দ উদ্‌যাপনের জন্য পূর্ব-পাকিস্তান যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছে তখন তাকে নিয়ে তার স্ত্রী প্রতিমা ডাকনাম কুসির উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার শেষ নেই। পূর্ব-পাকিস্তানের অজানা পরিস্থিতি সম্পর্কে তার উদ্বেগ, সতু কর্তৃক সান্ত্বনা ও নির্ভয়তার আশ্বাস, সংসারখরচের অর্থ প্রতিমার হাতে গুঁজে দিয়ে, ঘুমন্ত সন্তানের মুখ দেখে, তিন রাত পরে বাড়ি ফেরার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে সতু।

কলকাতার পথে বেরিয়ে বিস্মিত সতু দেখেছে দেশবিভাগের নিরানন্দের মাঝে কোনো আলোকসজ্জা হবে না — সরকারের এমন প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি কোথাও। বরং আলোর ঔজ্জ্বল্য দেখে মনেও হয়নি দেশকে টুকরো করা হয়েছে। মেইন স্টেশনে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে উদ্বাস্তু মুসলমান বিষণ্ন যাত্রীবাহী পূর্ব পাকিস্তানগামী স্পেশাল ট্রেন দেখে তারা প্রকৃত সত্যের মুখোমুখি হয়। সর্বজ্ঞ ঔপন্যাসিক তিন বন্ধুর দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করে তাদের মানস প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছেন নিচের অংশে :

> তিন বন্ধু পরস্পরের দিকে তাকাল। আবার দেখল গাড়িটা। তার মানে, এ গাড়ির যাত্রীরা সব কলকাতার আতুর নিরাশ্রয় মুসলমান। অনেকেই ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তির নিরাশ্রয় বাসিন্দা। এও কি সেই ক্যানাল ওয়েস্ট রোডের আশ্রিত আতুরদের স্পেশাল ট্রেন? এখন এদের চোখে-মুখে ভয় সন্দেহ। এরা কি জানে না, কলকাতায় আজ হিন্দু-মুসলমান হাতে হাত মিলিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই স্লোগানে কলকাতার আকাশ বাতাস মুখরিত। অবিশ্যি এখানে তা ভেসে আসছে না। কিন্তু ওরা যখন পূর্ব পাকিস্তানে পৌঁছুবে, তখন এরা কী রূপ ধারণ করবে? সতু গতকালই বলেছিল, "এদের চোয়াল কি নরম থাকবে?" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৫৩)

বিভিন্ন স্থানে নানা ধরনের বিশৃঙ্খলা ও গোলমালের কথা শুনে গোরা পূর্ব বাংলা যেতে ভয় পেলেও তারুণ্যের সাহসিকতায় সব তুচ্ছ করে নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেসে তারা যাত্রা করে। গতিশীল ট্রেনে বিচিত্র মানুষের সঙ্গে তিন বন্ধুর কথোপকথনের মাধ্যমেই

দেশবিভাগকালীন হিন্দু-মুসলমানের প্রতিক্রিয়া, তাদের বিচিত্র ভাবনাকে প্রকাশ করেছেন ঔপন্যাসিক। সৈয়দপুর রেলওয়ে ফ্যাক্টরির ফোরম্যান প্রায় পঞ্চাশ বছর বয়সী মিঃ জর্জ মিলার তিন তরুণের স্বদেশে স্বাধীনতার উৎসব উদ্‌যাপনের পরিবর্তে পূর্ব বাংলা দেখার কৌতূহলে বিস্মিত হয়েছেন। কিন্তু ওরা তাকে জানিয়েছে : "...বিভক্ত নতুন দেশটা দেখাই হবে আমাদের স্বাধীনতার উৎসব।" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৫৬)

এমনকি স্বাধীনতার স্বাদ উপভোগের অংশ হিসেবে তারা ট্রেনে বিনা টিকেটে ভ্রমণ করেছে। মিঃ জি মিলার তাদের নতুন দেশ পুনর্গঠনের জন্য জাতীয় সরকারের আমলে তাদের আরও বেশি দায়িত্বশীল হতে পরামর্শ দিয়েছেন। নিচের অংশটি অনুধাবনীয় :

> 'টিকেট না কাটার জন্য স্বাধীনতার স্বাদ!' ভদ্রলোক আবার সকৌতুকে হেসে উঠলেন, 'খুবই বিপজ্জনক উপভোগ। একটাই আশার কথা, কেবল এই কয়েকদিন, প্রথম আর শেষ তোমাদের বিনা ভাড়ায় রেল ভ্রমণ। অবিশ্যি, আমার ধারণা, আজ বা আরও কয়েকদিন, কেউ তোমাদের কাছে টিকেট চাইবে না। সবাই বোধহয় তোমাদের মতোই স্বাধীনতার উৎসবে মেতে আছে। তা ছাড়া, আমরা তো একটা কথা বলেই থাকি....ভদ্রলোক থেমে হিন্দিতে বললেন, 'সরকার কি মাল, দরিয়া মে ঢাল' এটা সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে খুব বেশি করে আছে। কিন্তু আজ থেকে তো এসব চিন্তা-ভাবনা আমাদের অনেকটা বদলাতে হবে। এখন তো আর বিদেশি সরকার নেই। জাতীয় সরকার। আমরা স্বাধীন।' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৫৬)

অ্যাংলোইন্ডিয়ান মিলারের কাছ থেকেই তিন বন্ধু জেনেছে নানা গুজব প্রচলিত থাকলেও এমনকি মুসলমানরা পুরো দিনাজপুর জেলা দাবি করলেও সীমানা কমিশন পুরো জেলাকে যে কোনো একটা দেশের ভাগে দেবে না কারণ বালুরঘাট রায়গঞ্জ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল। দিনাজপুর নিয়ে মিঃ র‍্যাডক্লিফের সংশয়ই সেখানকার গোলমালের মূল কারণ। দিনাজপুরের কিছু হিন্দু বড়লোক টাকা দিয়ে পশ্চিমের একটা অংশ ভারতের সঙ্গে রাখার চেষ্টা করছে। টাকাটা কে নেবে এ প্রশ্ন সতুর। মিঃ র‍্যাডক্লিফ বা সীমানা কমিশনের অবিচারের কথা লোকে জানলেও ঘুষের টাকা কারা নেবে সেটা জর্জ মিলারও জানে না। গোরার মনে হয় মনসুর মল্লিক সাহেবের কাছ থেকে শোনা হিন্দু বড়লোক জমিদারদের কথা যারা তিন কোটি টাকা তুলে খুলনাকে ভারতের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা করেছিল। গোরার বিশ্বাস তাকে না বললেও ও টাকা কাদের হাতে যাবে মনসুর মল্লিক সাহেব তা ভালো করেই জানেন।

মিলারের মধ্য দিয়েও অনিশ্চিত জীবনের কথা প্রকাশ করেছেন সমরেশ বসু। সৈয়দপুর রেলফ্যাক্টরির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই তিনি আছেন। যেখানে হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান সব ধর্মাবলম্বীর বাস। তার ছেলে ইছাপুর রাইফেল ফ্যাক্টরিতে ব্যারেল সেকশনে নতুন সুপারভাইজার হিসেবে কর্মরত, দু মেয়ের বয়স ষোলো থেকে আঠারোর মধ্যে। দেশবিভাগের ফলে ভারতে তিনি কবে আসতে পারবেন, কিংবা কোথায় তাকে পাঠাতে পারে এসব নিয়ে উদ্বিগ্ন তিনি। এ বিষয়ে খোঁজ নেবার জন্যই কলকাতায় এসেছিলেন

কিন্তু দু সপ্তাহের ছুটি থাকলেও ওয়ার্কস ম্যানেজারের টেলিগ্রাম পেয়ে তাকে সৈয়দপুর ফিরতে হচ্ছে। তার কাছ থেকেই তারা জানতে পারে অন্যান্য স্থানের মতো একটা চাপা উত্তেজনা থাকলেও সাম্প্রদায়িক গোলমাল সৈয়দপুরে নেই। মিঃ মিলারের মতো অ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কোনো ভাবনা নেই। ভারত সংবিধানে তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দেবে বলে তিনি কলকাতায় থাকতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবেন। পাকিস্তানের সংবিধানে তাদের অধিকারকে স্বীকৃতি দিলেও ভালো হবে। অবশ্য অল্পবয়সী অ্যাংলোইন্ডিয়ান তরুণরা ইংল্যান্ডে ফিরে যেতে আগ্রহী। কিন্তু মিলারের কাছে ভারতই তার নিজের দেশ। পূর্ব বাংলায় এসে তিন বন্ধুর কোনো বিপদ নাও হতে পারে বলেই মিঃ মিলার মনে করেন :

> '...আমার মনে হয় না, সে রকম কিছু বিপদে তোমরা পড়তে পারো।' তোমাদের মতো, এখন সবাই নতুন স্বাধীনতার আনন্দে মশগুল। অবিশ্যি তাদের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের আমি যুক্ত করব কি না, বুঝতে পারি না। রংপুর বা সৈয়দপুরের মতো জায়গায় গোলমাল না থাকলেও, হিন্দুদের মনে শান্তি নেই। কলকাতার মুসলমানদের মনে শান্তি আর ভরসা ফিরে আসছে। বিহারের মুসলমানদের মনে কি শান্তি আছে?...' তিনি চুরুটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে হাসলেন, 'দেশ বহুকাল বাদে স্বাধীন হল, এটা খুবই আনন্দের কথা। কিন্তু খুব আনন্দের সঙ্গে কি তা হল?' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৫৮-৬৫৯)

ট্রেন নৈহাটি জংশন পৌঁছালে, ভিন্ন কমপার্টমেন্টের সন্ধানে, সতু-বিজু-গোরা শুভরাত্রি জানিয়ে উঠে দাঁড়ায়। মিলারও দাঁড়িয়ে প্রত্যুত্তরে শুভরাত্রি জানিয়ে ওদের বিদায় জানান।

ওরা তিন জন নৈহাটি স্টেশনের তিন নম্বর প্ল্যাটফরমে পৌঁছায়। দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে, কিন্তু যাত্রীর ভিড় নেই। অথচ এ গাড়ি হলো নর্থবেঙ্গল এক্সপ্রেস। খাবারের সন্ধানে কিছুদূর এগিয়ে গেলে তাদের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত ময়লা ধুতি শার্ট পরা কালো লম্বা উগ্র সাম্প্রদায়িক, সুযোগসন্ধানী ব্যক্তির দেখা হয়। দেশভাগের কয়েক বছর আগেই সে নৈহাটিতে এসেছে। পূর্ব বাংলা থেকে প্রাণভয়ে পালিয়ে আসা হিন্দুদের বাসা ভাড়া করে দেওয়া, জমি কিনে দেওয়ার ব্যবস্থা করে যে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি করে। ভীত, শঙ্কিত গোরাকে সতু বলেছে : 'আর সত্যি কথা বলতে কী, আমরা কেবল আনন্দ করতেই যাচ্ছি? মজা করতে যাচ্ছি আমরা? আমি মনে করি, আমরাও তীর্থযাত্রী' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬১)। সতুর কথা শুনে অনামা লোকটি বিদ্রূপাত্মক কণ্ঠে বলে ওঠে :

> তীর্থযাত্রী? কোন তীর্থের ভাই? নতুন পূর্ব পাকিস্তান তীর্থ? (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬১)

তার প্রকৃত পরিচয় না জেনেই সতু নিজের আবেগ ও বিশ্বাসকে প্রকাশ করে ফেলে : 'না, নতুন পাকিস্তান তীর্থ নয়।' সতুর স্বরে তেজ ও ঝাঁজ, 'আমাদের দেশকেই টুকরো করা হয়েছে, আমাদের মানুষকেই, আমাদের কাছ থেকে আলাদা করে দেওয়া হয়েছে। এ তত্ত্ব যারা মানে, তারা মানে। আমরা মানিনে বলেই, ওই বিদেশিদের ভাগ করা দেশের অংশ আমাদের কাছে তীর্থ। সারা দেশই আমাদের কাছে তীর্থ। গান্ধীজি তো বলেছেন, সমগ্র দেশ আমার' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬১)। কিন্তু সতুর এ কথাকে

'ফাইজলামি মারা' বলে অভিহিত করে, লোকটি গান্ধীকে 'পাগল' আখ্যা দেওয়ায় সতু তাকে 'ছাগল' বলার পাশাপাশি সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়ানোর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে : '...অত্যন্ত জঘন্য লোক মশাই আপনি। কমিউনাল মাইন্ডেড। সারা দেশে যখন হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই করছে, আপনি তখন লোককে ভয় দেখাচ্ছেন। সাম্প্রদায়িকতা ছড়াচ্ছেন। আপনাকে তো পুলিশে ধরিয়ে দেওয়া উচিত' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬১)। প্রত্যুত্তরে সাম্প্রদায়িক লোকটি তাদের হত্যার হুমকি দিয়ে বলে :

> 'তার আগে, আপনাদের তিনটারে ধইরা এই নৈহাটি ইস্টিশনেই গুম্ কইরা দিতে পারি। তারপরে হাড় মাংস বেলেঘাটায় পাঠাইয়া দিমু। বেশি কথা কইবেন না। হিন্দু-মুসলিম ভাই ভাই? হালায় কইছে পুঙ্গির ভাই, আনন্দের আর সীমা নাই। যান — যান গিয়া। আর যদি চউখ থাকে, দেইখ্যা আইসেন, আপনাদের জাতভাইয়েরা কী অবস্থায় আছে।' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬১)

তারা কমিউনিস্ট কি না লোকটি জানতে চাইলে তার সাম্প্রদায়িক কথা শুনে ক্রুদ্ধ গোরা ব্যঙ্গভরে জানিয়েছে : "না, আমরা হিন্দু মহাসভা করি।"

ট্রেনের হুইসল্ বেজে উঠতেই ওরা এক কুঁজো জল নিয়ে প্রথম শ্রেণির কামরায় উঠে পড়ে। টিমটিমে আলো। ওরা নিচের আসনে বসে। বিজু পশ্চিমের দুটো জানালাই বন্ধ করে দেয়। ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু দীর্ঘসময় পর বহির্জাগতিক স্থান ও আকাশদৃশ্য উপস্থাপন করেন, যার মাঝে দ্যোতক উপাদান সক্রিয় থাকে :

> পুবের জানালা দিয়ে, বাইরের দৃশ্য আবছা দেখা যাচ্ছে। আকাশে চাঁদ আছে। পূর্ণিমার বেশি বাকি নেই। আজ কি দ্বাদশী না ত্রয়োদশী? আকাশ পাতলা সরের মতো মেঘে ঢাকা। জ্যোৎস্না ফুটে বেরোতে পারছে না। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬২)

কামরায় স্থির হয়ে বসে সতু সিগারেট ধরিয়ে বলে : "কেল্‌টে বদমাইস লোকটাকে আমার মারতে ইচ্ছে করছিল। গান্ধীজিকে বলে পাগল। সাংঘাতিক কমিউনাল। এই সব হিন্দুরাই দাঙ্গা বাধায়।" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬২)

এ পরিস্থিতিতে, কথোপকথন ও ভাবনা প্রসঙ্গে, মিঃ মিলারের সংলাপ মনে পড়ে। গান্ধীকে নিয়ে মিঃ মিলারের উপলব্ধি ও স্বীকারোক্তি :

> মিঃ মিলার তো শেষ কথা বলেই গেলেন। আর আমি মনে করি, মিলার সাহেব ভদ্রলোকের বুদ্ধি আছে। উনি তো বললেনেই, সবখানেই একটা উত্তেজনা অস্থিরতা রয়েছে, কিন্তু বিপদের ভয় নেই। আমি বলছি না, আমরা তিনজন এক-একটি মহাত্মা গান্ধী। আমরা তাঁর মতো ভয়ংকর দাঙ্গার সময় নোয়াখালি যেতে পারিনে। মিঃ মিলারের কথাটা খুব ভাল লেগেছে আমার। গ্রেট পিলগ্রিম। আমরা কোথায় যাচ্ছি? আমাদেরই দেশের ভাগ করা অংশে। সেখানে যাওয়াটাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস পালন করা। ওই বাজে কমিউনাল লোকটাকে আমি কী করে বোঝাব, গান্ধীজির 'সমগ্র দেশ আমার' বলার আসল মানেটা কী? উনি তো শুধু ওই কথাই বলেননি। বলেছেন, 'আমি পাকিস্তানেও গিয়ে থাকতে চাই।' তার মানে কী? দেশের একটা অংশ পাকিস্তান হয়েছে। হোক। তবু

তিনি সেখানে গিয়ে থাকতে চান। তিনি সম্পর্ক ত্যাগ করতে চান না। তা সে হিন্দুস্তান-পাকিস্তান, যে-নামেই এদেশকে বলা হোক।' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬২-৬৩)

সতু-বিজু-গোরা ট্রেনের যে কামরায় বসে পরস্পর আলাপ করছিল, সেখানেই রংপুরনিবাসী ধর্মপ্রাণ মুসলমান, রুপোলি গোঁফ-দাড়ি ভরা ফরসা মুখ সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলামের সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। সৌম্যদর্শন ভদ্রলোক সাধকের মতো। ইতোমধ্যে ভোরের রোদ এসে পড়ছে, ছুটন্ত কামরায়। বিজু ঘুম থেকে উঠে সবগুলো জানালা খুলে দেয়। ওদের তীর্থভূমি পূর্ব বাংলার চলমান ভূদৃশ্য, ঔপন্যাসিক সমরেশ বসু স্কেচধর্মী চিত্রাত্মক পরিচর্যায় রূপান্বিত করেছেন :

বর্ষা ভেজা, অথচ মেঘহীন আকাশের রোদ চড়া না। এখনও নরম, আর অনুজ্জ্বল। ...বাইরে দিগন্তব্যাপী শস্যের মাঠ। ধান আর পাট ছাড়া কিছুই চোখে পড়ে না। শেষ শ্রাবণে এখন আমন ধান। পাটগাছগুলো কী লম্বা। যেন অরণ্যের মতো আকাশের দিকে উঠে গিয়েছে। মাঝে মাঝেই, আয়নার মতো এক-একটা নানা আকারের জলাশয় দেখা যাচ্ছে। কোথাও পাট পচানো হচ্ছে। কিন্তু লোকজন প্রায়ই দেখা যাচ্ছে না। একটি বড় গাছের মাথায় প্রথম, পূর্ব পাকিস্তানের পতাকা চোখে পড়ল। গাছের মাথা ছাড়িয়ে না উঠলে, সবুজ রং চেনাই যেত না। সবুজে সবুজে মিশে যেত। সবুজ পতাকার এক চতুর্থাংশ সাদা। মাঝখানে অর্ধচন্দ্র, পাঁচ কোনা তারকা। অবশ্যি পতাকাটি দেখে কিছুই ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। রাত্রে বোধ হয় বৃষ্টি হয়েছিল। সরু কঞ্চিতে টাঙানো পতাকা স্থির হয়ে ঝুলছে। বাইরে বাতাসও নেই। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬৫-৬৬)

সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলাম, মোক্তারি করার পাশাপাশি তামাক চাষ ও ব্যবসা করেন। তার দুই ছেলে ঢাকা ও রাজশাহীতে কলেজে অধ্যাপনা করে। দুজনেই মুসলিম লিগের সঙ্গে যুক্ত। কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন এ তিন তরুণের আলোচনায় তিনি মুগ্ধ হন। নিজের মনের রাজনীতি-চিন্তার প্রতিধ্বনি শুনতে পান তাদের কণ্ঠে। শুধু তাই নয়, তাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনার প্রমাণ পেয়ে ও পূর্ববঙ্গে আগমনের কারণ শুনে এবং এদিকে কোনো আত্মীয়স্বজন নেই জেনে সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলাম, তাদের রংপুরে নিজগৃহে ঈদের দিন কাটানোসহ তিনদিনের 'মেহ্‌মান' হওয়ার উদার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। এমনকি মুসলমান হিসেবে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণে আপত্তি থাকলে হিন্দু বন্ধুর বাড়িতে ব্যবস্থা করে দেবেন বলেও জানান তিনি। মনেপ্রাণে একজন মুসলমান হয়েও মুসলিম লিগের রাজনীতিতে আস্থা নেই তার। এটি তার কাছে 'হিন্দু-মোছলমানের' রাজনীতি বলে বিবেচিত হয়। বরং গান্ধীর ধর্মনিরপেক্ষ উদার অসাম্প্রদায়িক মানববাদ বদরুদ্দিন ইসলামের আরাধ্য। এ কারণেই স্বাধীনতা দিবসে রংপুরে থাকার পরিবর্তে সৈয়দ বদরুদ্দিন গান্ধীকে দেখতে কলকাতায় এসেছিলেন। সুভাষ বসুর সঙ্গে গান্ধীর বিরোধ ও কংগ্রেস ত্যাগের কারণে তাঁর হিন্দু বন্ধুরা গান্ধীকে অভিযুক্ত করে। এজন্য তাঁর গান্ধীভক্তি দেখে রাগ করলেও তিনি বিশ্বাস করেন ছেচল্লিশ সালের ষোলোই আগস্ট কিংবা পরবর্তীকালে সৃষ্ট দাঙ্গায় গান্ধীই মুসলমানদের রক্ষা করেছিলেন। এছাড়া সুভাষ বসুর সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব যে কংগ্রেসকে সুরক্ষিত রাখবার জন্য,

এটাও মনে করেন সৈয়দ বদরুদ্দিন। তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দীরও সমালোচনা করেন। তারপরও রাজনীতিসচেতন বদরুদ্দিন উনিশশো ছেচল্লিশ সালে ভেবেছিলেন ইংরেজ জিতলেও বিভক্ত দেশে হিন্দু-মুসলমান হয়তো সুখেই বাস করবে। কারণ তিনি দেখেছেন কংগ্রেস হিন্দুর ও মুসলিম লিগ মুসলিম স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে। কিন্তু ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্টে এসেও তিনি সে সুখ কিংবা শান্তির কোনো সম্ভাবনা দেখতে পান না, বরং ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ পরবর্তী প্রতিক্রিয়া হিসেবে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বহ্নিশিখা কতটা বিস্তৃত হতে পারে তা সহজেই অনুমান করতে পারেন। তার এ উৎকণ্ঠা-আশঙ্কা তিন বন্ধুর কাছে প্রকাশ করলে সতু 'দেশের অবস্থা কি আপনার খারাপ মনে হয়?' এ প্রশ্ন উত্থাপন করলে, বিষণ্ন বদরুদ্দিন মহাভারতের প্রসঙ্গ উদ্ধৃত করে ভয়ার্ত কণ্ঠে উচ্চারণ করেন :

তোমরা পড়িছ, মনে করতে পারবে। যে-দিন দুর্যোধন জন্মিল, সেই দিন বেদব্যাস তাঁর মা সত্যবতীরে কহিছিলেন, মা সামনে বড় দুর্দিন। মিথ্যা কহেন নাই। ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ — সব দিকে অন্ধ। ভাই ভাতিজার রাজ্য লইয়া যুদ্ধ, আর সবংশে নির্বংশ। ভাগাভাগি হইছিল, ভাই ভাইরা নিজের রাজ্য লইয়া সুখে ক্যান থাকতে পারল না? হিংসা। বাবারা, কহিতে ডরাই। আমার মনে লয়, সামনে দুর্দিন। গতকাল মহাত্মা উপাস দিলেন, কিন্তু মনেরে কী দিয়া বুঝান? জিন্না কহিলেন, তাঁরে মুসলমানরা ডাকুক, তিনি ভারত থেকে পাকিস্তানের বড়লাট হইয়া শাসন করতে যাইবেন। এত বড় মানুষটার এইটা কী মতি? লাহোরে আগুন জ্বলতেছে। পাঞ্জাবে আগুন জ্বলতেছে। বাংলায় কি ক্যাবল ম্যাঘনা শীতলক্ষার ঠাণ্ডা পানির সোঁত বহিছে? একজন বেলেঘাটায় একটা পচা মোকামে বইসা হাসতেছেন, কাঁদতেছেন। আর মাউন্টব্যাটেন সাহেব কংগ্রেসেরে যেমন খেলাইতেছেন, কংগ্রেস তেমন খেলতেছে। লিগের ত কথাই নাই। বাবারা, এই বুড়ারে মাপ কর। আমার ঘাড়ে শয়তান ভর করছে নাকি কে জানে? আমার বড় ডর, সামনে দুর্দিন। তোমরা ট্যার পাও না, পায়ের নিচে জমিন কাঁপতেছে। পরশু রাত্রে সুদিন শ্যাষ হইয়া গেছে... (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৬৭)

ইতিহাসের ছাত্র বিজুর সঙ্গে বদরুদ্দিনের কথোপকথন থেকে সমরেশ বসু দেশবিভাগের নেপথ্য নায়কদের ভূমিকা দেখিয়েছেন। এ দুর্দিন দেশবিভাগের আগে সেই ১৯৪৫-৪৬ সালের আই এন এস-এর বন্দিমুক্তি আন্দোলনের সময় থেকেই শুরু। রশীদ আলি দিবস আর নৌবাহিনীর বিদ্রোহের সময়ই এট্‌লি ভারতের স্বাধীনতা দেবার কথা ঘোষণা করলেও তার মন্ত্রণাদাতাদের কারণে সেটা না হলে শুরু হয় দেশবিভাগের নতুন নাটক। যা লেখেন মাউন্টব্যাটেন। গান্ধীকে সেই বলেছিল 'কংগ্রেস আর আপনার লগে নাই, কংগ্রেস আমার লগে।' মাউন্টব্যাটেনের মিথ্যাচারিতা 'আমি আর মহাত্মাজি, এই দুইজন মাত্র দেশ বিভাগ চাই নাই' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৭১)। মাউন্টব্যাটেনের এ নাটকে মুসলিম লিগ ও কংগ্রেস নেতারা অভিনয় করেছিল মাত্র। প্রসঙ্গক্রমে গান্ধী-জিন্না, জহরলাল-প্যাটেল-লিয়াকৎ, সোহরাওয়ার্দী-নাজিমুদ্দিন, ওয়াসিম উকিল-হামিদুল হকের ভূমিকার কথা এসেছে। কোনো রাজনৈতিক দলে না থাকলেও বদরুদ্দিন

ইসলামের রাজনৈতিক সচেতনতা তিন বন্ধুর সঙ্গে কথোপকথনে প্রকাশিত হয়েছে। এ দুর্দিন ধীরে ধীরে এসেছে এ পর্যবেক্ষণ তাঁর। নিজ জীবন দিয়ে হলেও গান্ধী হিন্দু-মুসলমান ঐক্য বজায় রাখতে চেয়েছেন। দেশভাগের চেয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দশ বছর সংগ্রাম করা ভালো বলে তাঁর অভিমত। এমনকি ঐক্য বা অখণ্ডতা বজায় রাখার জন্য দরকার হলে জিন্নাকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী করারও প্রস্তাব করেন গান্ধী, এ কারণে বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর মুখ দেখতেও চাননি। অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির বিকল্প নেতৃত্ব তৈরি করলে ইংরেজদের দেশভাগের নীতি ধ্বংস হতো — এ খেদোক্তি তাঁর আজীবন ছিল। দেশবিভাগ চাননি বলে তাঁকে হত্যা করাও হতে পারে সুগভীর দূরদৃষ্টি দিয়ে এটাও বুঝেছিলেন তিনি, যা পরবর্তীকালে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৭০-৭১)

সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলাম তিন বন্ধুকে তিন রাত্রি রংপুরে তাঁর মেহমান করে রেখেছিলেন। স্টেশনের কাছেই, লালবাগ এলাকায় তাঁর দোতলা বাড়ি। তিন বন্ধুর চোখে রংপুর শহরকে অনেকটা লাল শহর বলে মনে হয়েছে। অন্যদিকে তিন হিন্দু মেহ্মানকে নিয়ে সৈয়দ বদরুদ্দিন শহরে একটা হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ওদেরকে দেখতে এসেছিলেন অনেকেই। এদের মধ্যে ছিলেন জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান মৌলানা মহাম্মদ আমিন, মুসলিম লিগের প্রেসিডেন্ট বদরুদ্দিন আহ্মেদ, কংগ্রেস নেতা বিশিষ্ট হিন্দু ধনী অতুলকৃষ্ণ রায়, সাহিগঞ্জের বালধর সিংহ, সুশীলচন্দ্র দেবের মতো বিশিষ্ট ব্যক্তি। বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হলেও হিন্দুদের মনের ভীতি তাদের অজানা থাকেনি। এ কারণেই কোনো হিন্দুর বাড়িতেই তারা নিমন্ত্রিত হননি। বিমলচন্দ্র রায় নামে এক হিন্দু ভদ্রলোক নিজে রংপুরে থেকে গেলেও তার ছোট ভাই এখানে থাকার সাহস পাননি। রংপুরে শান্তি বজায় থাকলেও গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যে ভালো নয়, সেটা বদরুদ্দিন সাহেবের কথাতেই তারা বুঝতে পারে। সৈয়দ বদরুদ্দিন সাহেবের বাড়িতে এলেও, হিন্দু-মুসলমান উভয়েই তিন বন্ধুকে সন্দেহের চোখে দেখেছে।

উনিশ আগস্ট, তিন বন্ধু রংপুর থেকে সৈয়দপুরে গিয়ে পৌঁছায়। সতু, বিজু ও গোরা তাদের বন্ধু মধুসূদন প্রসাদের দাদা সৈয়দপুরের রেলওয়ে ফ্যাক্টরিতে কর্মরত বিহারি কায়স্থ হরিসূদন প্রসাদের বাড়িতে আসে। দু বছর আগে বিহারের জামালপুরে কাজ করার পরে এখানে বদলি করা হয় তাকে। কিন্তু তখন সে জানত না যে স্বাধীনতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেশভাগ নামক 'একখানি বাঁশ'ও তাদের জীবনে আসবে। তার সঙ্গে কথোপকথনেই উঠে আসে সেখানকার দেশভাগ-পরবর্তী পরিস্থিতি। রেলওয়ে ফ্যাক্টরির হিন্দু-মুসলমান ওয়ার্কারদের মধ্যে সদ্ভাব বজায় থাকলেও স্থানীয় হিন্দু, বাঙালি, বিহারি, ওড়িয়া, মাদ্রাজি হিন্দুদের মনে স্বস্তি নেই। এর কারণ সুযোগসন্ধানী প্রমোশনপ্রত্যাশী কিছু মুসলমান নিজেদের লাভের কথা বিবেচনা করে হাসিমুখে প্রকাশ্যেই হিন্দুদের স্বদেশভূমি ভারতে ফিরে যাবার প্রস্তাব করে। এছাড়া সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন কিছু অশিক্ষিত মুসলমান তখন সমাজবিরোধীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল যারা নানা রকম

গুজব সৃষ্টির মধ্য দিয়ে হিন্দুদের মনে ভীতির সঞ্চার করে। অবশ্য এর বিপরীতে ভালো, শিক্ষিত ভদ্রলোক মুসলমানও ছিলেন যারা হিন্দুদের সঙ্গে প্রাণখুলে কথাবার্তা বলেন। তাদের মধ্যে এমন অনেকেও আছেন যারা দেশভাগ চাননি। আবার তাদেরই কেউ কেউ হিন্দুদের 'জিম্মি' বলে মনে করেন। কেউ কেউ আবার কলকাতার খবরের কাগজের ওপর এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে হরিদার জন্য আসা 'আনন্দবাজার' পত্রিকা ছিনিয়ে নিত। তবে শ্রমজীবী কৃষক শ্রেণি ছাড়া সকলেই স্বাধীনতা উদ্‌যাপনের আনন্দে মত্ত থাকায় কিছুটা উদ্বেগ থাকলেও হরিদা খুব একটা খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে পড়েনি বলে জানিয়েছে। সেখানে মুসলমানদের মধ্যে গান্ধীকে নিয়ে তেমন আগ্রহ না থাকলেও শরৎ বসুর কংগ্রেস সমালোচনায় তারা সন্তুষ্ট।

পরের দিন, ২০ আগস্ট, সকালবেলা আলু-পেঁয়াজ ভাজা আর চা দিয়ে প্রাতরাশ হলো ওদের। হরিসূদন ওদের নিয়ে বাজার ঘুরতে গেল। বাজার করে ফেরার পথে, একটা বড়ো দোকানের সামনে দাঁড়াল। দেখছিল আশেপাশে :

> জায়গাটা দুটো রাস্তার মোড়ের কাছে। সৈয়দপুর এখনো তার গ্রাম্য চেহারাটা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। কাঁচড়াপাড়ার যে আধা-শহর আধা-গ্রাম আধখেঁচড়া চেহারা, সেরকমও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু রেলওয়ে ফ্যাক্টরির কাছাকাছি, রেলের বাংলো আর তখনও কিছু কোয়ার্টার যেখানে আছে, সেখানটা পরিচ্ছন্ন আর সুন্দর। মোটর রাস্তা আছে, দিনাজপুর আর রংপুর যাবার জন্য। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৭৬)

সেখানে ওরা পরিচিত হয়, কারমাইকেল কলেজের বাংলার লেকচারার, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ, এবং জমিদারপুত্র জাব্বরের সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথা বলে তিন বন্ধু উচ্চশিক্ষিত অথচ গোঁড়া মুসলমানদের দেশভাগ-সম্পর্কিত ক্ষোভের কথা বুঝতে পেরেছে। বিভক্ত বাংলার 'নতুন রূপ' দেখতে স্বাধীনতা দিবসেই তারা এখানে এসেছে শুনে বিস্মিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রংপুরের সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলামের মতো অসাম্প্রদায়িক গান্ধীভক্ত মানুষকে 'পাগলা বুড়া', কিংবা 'পীর ফকির' বলে বিদ্রূপ করতেও সংকচ বোধ হয়নি জাব্বরের। ওরাও আর কোনো মন্তব্য করল না। এমন সময় হৈহৈ পড়ে গেল। একজন কেউ চিলের ডাকের মতো শিস্ দেয়। কেউ নোংরা খিস্তি করে। ইতোমধ্যে তিন বন্ধু হরিসূদনের চোখের ইশারায় রাস্তার সামনের দিকে তাকাল :

> দেখল, বিবর্ণ রং উঠে-যাওয়া লাল ঘাগরা পরা একটি মেয়ে এদিকেই আসছে। গায়ে তার ঘাগরার মতোই পুরনো একদা বেগুনি রং ধুয়ে যাওয়া জামা। মলমলের গোলাপি রঙের ফিনফিনে, মাড়বিহীন ওড়নাটা তেমন পুরনো না। সে যত এগিয়ে আসতে লাগল, চেহারা তত স্পষ্ট হল। বোধহয় গায়ের রং তার ফরসাই। কিন্তু এখন দেখাচ্ছে অনেকটা মাজা-ঘষা পুরনো তামার মতো। উন্নতনাসা, প্রতিমার মতোই আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ। চোখের তারা দুটো কালো না। ঈষৎ পিঙ্গল। মাথার চুল খোলা, উসকো-খুসকো। একরাশ কালো কেউটের মতো জড়াজড়ি পাকানো। অথচ একটি বেণী পিঠে ঝুলছে। তার শরীরের উদ্ধত যৌবনে একটা অশ্লীলতা যেন ফুটে উঠেছে। সুগঠিত সুন্দর স্বাস্থ্য,

> অথচ তাকে দেখাচ্ছে অগ্নিশিখার মতো। তার চলার ছন্দে একটা নাচের ভঙ্গি, যে-কারণে উদ্ধত বুকেও নাচের ছন্দ। প্রশস্ত সুঠাম নিতম্বে নাচেরই তাল। বয়স কত? আঠারো না আটাশ? বোধহয় এই শরীর ও অগ্নিশিখা রূপ দেখে, দেবতাদেরও হিসাব মিলবে না। সে কি সুন্দরী? তাও যেন বলা যায় না। তাকে দেখে চোখ ঝলসে যায়। পুরুষের রক্তে মুহূর্তেই আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। এবং বোধহয় পুড়িয়েও মারতে পারে। এ যেন এক মূর্তিমতী রতি, যাকে পেয়েও কোনও কালে কোনও পুরুষ তৃপ্ত হবে না। শান্তি পাবে না। ঔদ্ধত্য তার চোখে-মুখে। বেপরোয়া ভঙ্গি। কারওর দিকে ফিরেও দেখছে না। অথচ তার উদ্দেশে নানা ইতর অশ্লীল মন্তব্যগুলোকে যেন সে ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসি দিয়ে উড়িয়ে দিচ্ছে। অথবা প্রশ্রয়ই দিচ্ছে। বাঁ হাত তার ওড়নায় ঢাকা। ডান হাতের দু পিঠেই মেহেদি মাখা, আর গাঢ় নীল রঙের এক রাশ কাচের চুড়ি। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৭৮)

সমরেশ বসুর উল্লিখিত চিত্রময় শব্দ-বুনটে যৌন উপাদান আছে, কিন্তু উত্তেজনা নেই। একটি সংযত শান্ততা, বিহ্বলতা ও প্রতীকী আকাঙ্ক্ষা এবং সূক্ষ্ম রহস্যময়তা ন্যারেটিভকে শিল্পমার্জিত করেছে। 'উন্নতনাসা, প্রতিমার মতোই আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ' উপমানচিত্রে এখানে ভিন্ন তাৎপর্য সংযোজন করে। স্মরণ রাখতে হবে, 'এই প্রতিমার মতোই আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ' নারীপ্রতিমাকে অবলম্বন করেই *খণ্ডিতার* সকল রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা স্রোত, ঘটনা-ধারা উপন্যাসের অন্তিমে, তীব্র বলয় সৃষ্টি করে প্রতীকে তরঙ্গিত হয়েছে।

হরিসূদন চায়ের কাপে শেষ চুমুক দিয়ে বলে, 'ও হল এখানকার নট সেটেলমেন্টের মেয়ে, নাম মোতি' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৭৯)। জাব্বর চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে জানায় : সেটেলমেন্ট হলো এক ধরনের কলোনি। আসলে জেলখানাই বলা যায়। নট হলো যাযাবর শ্রেণি, এরা সার্কাসের খেলা, ম্যাজিক দেখায়। জড়ি বুটি মাদুলি কবচ ওষুধ দেয়। চুরি ডাকাতি করা ওদের পেশা। সে জন্যই ব্রিটিশ সরকার ওদের সেটেলমেন্টের জেলখানায় আটকে রাখে। সেটেলমেন্টের সুপারিনটেনডেন্ট, অফিসার, সেপাই সবই আছে। প্রাচীর ঘেরা সেটেলমেন্টে পাহারাও আছে। প্রচারিত আছে সেটেলমেন্টের সুপারের অফিসারের সুনজর থাকায়, মোতি বাইরে আসার অনুমতি পায়। মোতির কব্জির কাছ থেকে ওর বাঁ হাতটা নেই, চুরি করতে গিয়ে গ্রামের লোকেরা কাটারি দিয়ে কেটে দিয়েছিল। অথচ মোতি বলে, "ওর তখন পাঁচ বছর বয়স ছিল। ওদেরই একজন চুরি করে পালিয়ে গেছলো, আর ওকে ধরে, গ্রামের লোকেরা হাত কেটে দিয়েছে।" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৭৯)

জাব্বর প্রসঙ্গান্তরে যায়, আবার প্রশ্ন করে দেশভাগ, রাজনীতিকদের নানা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে, ভবিষ্যৎ ভাবনা বিষয়ে। ১৫ আগস্টের পরেও 'খণ্ডিত বাংলা আবার এক হইবে।' — কংগ্রেস নেতা প্রফুল্লবাবুর এ কথা কিংবা কৃপালনীর 'কংগ্রেস ও জাতি অখণ্ড ভারতের দাবি পরিত্যাগ করে নাই' এবং 'ঐতিহাসিক আর রাজনৈতিক কারণেই নাকি, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একতার সৃষ্টি' হবে পত্রিকায় প্রকাশিত এসব সংবাদ পড়ে

যেসব মুসলমান নিজেদের অস্তিত্বহীন ভাবতে শুরু করেছিল তাদেরই একজন জাব্বর। গান্ধীর প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ করে বঞ্চিত মুসলমানদের ক্ষোভ উচ্চারিত হয়েছে জাব্বরের কণ্ঠে। এর মধ্য দিয়ে সতু সৈয়দ বদরুদ্দিন সাহেবের বলা সেই দুর্দিনের আভাস পেয়েছে। নিচের অংশে তারই প্রকাশ ঘটেছে :

> তিনি বুদ্ধ যিশু, যা খুশি হইতে পারেন, তাতে কী? ...তিনি দ্যাশ বিভাগ চান নাই। কিন্তু দ্যাশ তো বিভাগ হইছে। অবশ্য অত্যন্ত অন্যায়ভাবে ভাগ হইছে। বাঙালি মুসলমানদের ভালই অর্ধচন্দ্র দেখান হইছে। খুলনা আর মুর্শিদাবাদ লইয়া খেলা ভালই জমছিল। শ্যাষে খুলনা গেল পূর্ব পাকিস্তানে, মুর্শিদাবাদ গেল ভারতে। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের কী সুবিচার! মুর্শিদাবাদ যে কী কইরা ভারতে যায়, আমরা কোনোদিনই তা বুঝতে পারুম না। তা সে যাই হউক, দ্যাশ ভাগ ত হইছে। তবে আর এখন এইসব কথা কওনের অর্থ কী? পাকিস্তান থাকব না। এইটাই কি তাঁরা বিশ্বাস করেন নাকি? (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৮০)

জাব্বর হরিসূদনকে জানায় চা-পানির নিমন্ত্রণ, মেহ্মানদের নিয়ে সন্ধ্যায় তার মোকামে যেতে। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় যাবার অঙ্গীকার করে ওরা উঠে দাঁড়ায়। ওরা চারজন বাড়ির দিকে অগ্রসর হয়।

পথ চলতে চলতে, রাজনীতিক প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে সতু নট সেটেলমেন্ট সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আলোচনাক্রমে সতু জানতে চায় সেটেলমেন্টের ভেতরে যেতে দেয় কি না। হরিসূদন জানায়, বললে যেতে দেয়। সুপার একজন বাঙালি হিন্দু ভদ্রলোক। মি. জে. কে. মুখার্জি। অফিসার-ইন-চার্জ হরিসূদনের জেলার লোক, বিহারি মুসলমান আরিফ হোসেন। ওরা চারজন বাসায় পৌঁছে, বাড়ির উঠানে ঝম্‌ঝম্ মল বেজে উঠল, দুলিয়া ভাবি।

বেলা প্রায় সাড়ে তিনটার সময়, তিন বন্ধু হরিদার সঙ্গে সৈয়দপুর শহরের এক প্রান্তে এল। অফিসার-ইন-চার্জ আরিফ হোসেনের অনুরোধে, ওরা সেটেলমেন্ট দেখার অনুমতি পায়। পথপ্রদর্শক সত্যেন নাহা, বাড়ি ফরিদপুরে, মাদারিপুর। তিন বন্ধু কলকাতা থেকে এসেছে জেনে, বিস্মিত সত্যেনের প্রশ্ন, "কইলকাতা ছাইড়া এই নরকে? ক্যান?" (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৮২)। সতুর প্রশ্ন, "নরক কেন?" সত্যেন নাহার জবাবে, তিন বন্ধু পূর্ব বাংলার আর এক বাস্তবতা জানতে পারে। সত্যেন নাহা অসহায়ভাবে বলে :

> ... জানেন, চোদ্দোই আগস্ট নারায়ণগঞ্জ থেইক্যা তিনটা স্পেশ্যাল স্টিমার কেন রোজ গোয়ালন্দ যাইতেছে? হিন্দুরা পলাইতেছে। একমাত্র বড়লোক আর কংগ্রেসের নেতারা অ্যারোপ্লেনে কইরা দিনে চাইরবার ঢাকা-কলকাতা খ্যাপ মারতেছে। এইসব তো খবরের কাগজের ছাপা খবর। ফরিদপুর থেইক্যা আমার দাদারা বউদিরা, পোলা-মাইয়া লইয়া পলাইয়া গেছে। বুড়া বাবা-মা রইছে। মুনশিগঞ্জে হিন্দুদের পাইকারি হারে খুন করছে কয়দিন আগে। মাইয়া বউদের লইয়া গেছে, ধর্ষণ আর পাশবিক অত্যাচার চলতাছে। কুষ্টিয়ায় কইলকাতার পথে রেলগাড়ি থামাইয়া রোজই লুট হইতেছে। কী হইতেছে না, কন তো? (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৮৩-৮৪)

সত্যেন বিশ্বাস করে চারদিকের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে।

সতুর স্বর গম্ভীর, বলে, 'কলকাতায় গান্ধীজি না থাকলে, সেখানেও এখন মুসলমান খুন চলতে থাকত। সেখানেও খুন, ধর্ষণ, লুটপাট সবই চলছিল। এখনো চোরাগোপ্তা চলছে' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৮৪)ভ সত্যেন সেন অনর্গল বলে চলে :

> 'দ্যাশ বিভাগ কে চাইছেন কন?' সত্যেনের অসহায় জিজ্ঞাসা, 'আমি চাই নাই। আমার মতন হাজার হাজার মানুষ চাই নাই। আমরা জানিই না, ক্যান, কীসের দ্যাশভাগ। এখন মুসলমানরা কইতেছে, পূর্ববঙ্গ কীসের? সমস্ত বঙ্গদেশই পূর্বপাকিস্তান হইব।' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৮৪)

জানা গেল কথাটা কেবল গুজব নয়, ও রকম পোস্টার সৈয়দপুরেও পড়েছে, হরিসূদনও তা স্বীকার করে। ঢাকা শহরের যে দুশো আশিটা বাড়ি পাকিস্তান সরকার সরকারি কাজের জন্য নিয়েছে তার বেশিরভাগই হিন্দু মালিকানাধীন ছিল। নট সেটেলমেন্টের সুপার হিন্দু বাঙালি মিঃ জে. কে. মুখার্জির পৈতৃক বাড়িও তার মধ্যে পড়েছিল। সত্যেন নাহা বিশ্বাস করে, চারদিকের পরিস্থিতি দিন দিন খারাপ হচ্ছে। স্বাধীনতা এলে শান্তিও আসবে এমন মনে করলেও সে এখন শুধু দেখতে পাচ্ছে চিতার বহ্যুৎসব।

সত্যেন নাহা, ওদের চারজনকে নিয়ে, হলুদ প্রাচীর ঘেরা ঘরবাড়ি জঙ্গলাবৃত বিশাল 'নট সেটেলমেন্টে'র খয়েরি রঙের গেট দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করে। ওরা দেখে ভেতরের জগৎ বিচিত্র — ডুপকির শব্দ, প্রেমজুরির ঝুনঝুন, নারী কণ্ঠের নিচু স্বরের দুর্বোধ্য গান, একটি ছেলে শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে দাঁড়াল। একটি বারো বছরের মেয়ে, কোমর দুলিয়ে, হাতের ভঙ্গি করে নাচছে। গাছের ছায়ায় বসে এক লোলচর্ম বৃদ্ধা চরকা কাটছে। আরও এগিয়ে গেলে, ডান দিকে সারি সারি দুর্গন্ধভরা খুপরি ঘর। কিছু বিপজ্জনক নারী-পুরুষকে সন্ধ্যার পর লোহার গারদের মধ্যে তালাবদ্ধ করা হয়। এ ছাড়াও বিশাল শেডের লোহার গারদের মধ্যে নারী-পুরুষ-শিশু একত্রে থাকে। দরজা রাত্রে বন্ধ করে দেওয়া হয়। কয়েকজন খোলা ঘরে থাকে, সেটেলমেন্টের বাইরেও তাদের যেতে দেওয়া হয়। সত্যেন নাহা সবাইকে নিয়ে একটা শেডের মধ্যে প্রবেশ করে। খট খট তাঁত চলছে; বেশির ভাগ তাঁত পুরুষরাই চালাচ্ছে। সেখান থেকে বেরিয়ে, ওরা লোহার জালে ঘেরা বিরাট ঘেরাওয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। ওরা দেখতে পায় — নারকেল আর পাটের দড়ি পাকানো থেকে, পাটি মাদুর ধামা চুপড়ি সবই বোনা হচ্ছে। তরুণীদের চোখে ঝিলিক, আর ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। কিন্তু সকলের চোখেই যেন খাঁচার পাখির একটা সন্দিগ্ধ অস্থিরতা।

সতু খাঁচার বাইরে বেরিয়ে, একটা গাছের তলায় এগিয়ে গেল। আদ্যিকালের তামাটে রং নগ্নপ্রায় এক বৃদ্ধ সতুকে স্থানীয় বাংলায় জিজ্ঞেস করে, "মোতিরে দ্যাখবা? খোঁজে আইছ?"... বৃদ্ধ ডান হাত তুলে পশ্চিমে দেখালো, 'ওই যে হিজল আর শ্যাওড়ার জঙ্গল

— ওইখানে যাও। মোতির ঘর ওইখানে' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৮৬)। সতু হিজল আর শ্যাওড়ার কৃষ্ণ সবুজে হারিয়ে গেল। মোতির অশালীন পোশাক-আচরণ-চৌর্যবৃত্তির কিছু প্রমাণ পাবার পর, সতু জিজ্ঞাসা করে, 'তুমি কে?' উত্তরে মোতি জানায় :

> 'আমি মোতি নট। বাইদ্যা, বাইদ্যা বোঝ? ইংরেজিতে কয় নোমাঙ্কি।' অনাবৃত অধরা কম্পিত বুকে জামা টেনে দিল।
>
> মোতির মুখে ইংরাজি? অবাক সতুর জিজ্ঞাসা, 'তোমরা হিন্দু না মুসলমান?'
>
> 'আমরা না-মোছলমান, না-হিন্দু।' রক্তে আগুন ধরানো হাসি মোতির বাঁশির স্বরে বেজে উঠল, 'মা কালী ভজি, পিরেরেও ভজি। রুদ্রাক্ষ পরি, তসবিও পরি। গোরু খাই, শুয়োর খাই। আমারে হিন্দুও খায়, মোছলমানেও খায়। আমি জমিন। জমিন সবাই চায়। সবাই চষে। জমিন লইয়া খুনাখুনি করে।' হাসিতে মোতির আগুনের শিখা শরীর লেলিহান হয়ে কেঁপে উঠল। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৮৭)

কলকাতার নতুন যুগের 'প্রতিশ্রুতিমান কবি' সত্যেশ চট্টোপাধ্যায় সতুর বুক কেঁপে ওঠে। মোতির কথাগুলো তার বুক বিদীর্ণ করছে, ছিন্নভিন্ন করছে। তার কথায় বাংলার বাউলতত্ত্ব প্রতিধ্বনিত হয়। "আমারে হিন্দুও খায়, মোছলমানেও খায়। আমি জমিন। জমিন সবাই চায়। সবাই চষে। জমিন লইয়া খুনোখুনি করে।" — এ অতলস্পর্শী প্রসারিত সংলাপের মধ্য দিয়ে, সমরেশ বসু মোতিকে স্বদেশ-রূপকের সংকেত দিয়েছেন; তাকে বিনির্মাণ করতে চান, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। এসময় পরস্পরিতভাবে, সতুর সন্নিকর্ষ চিন্তা : "স্বাধীন ভারতীয়। গান্ধীজি স্বাধীনতার দিন অনশন দিয়ে তা বরণ করেছেন, আত্মশুদ্ধির জন্য। কলকাতার মুসলমানদের বাঁচাচ্ছেন। আর স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগের জন্য ভারতের তিন তীর্থযাত্রী নতুন বিভক্ত দেশে এসেছে। তাদের একজন এক যাযাবরীর সামনে দাঁড়িয়ে, অজস্রবার কথিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি শুনছে। ভয় পাচ্ছে।" অতঃপর মোতির জিজ্ঞাসা :

> 'তুমি আমারে ছাইড়া পলাও ক্যান?' মোতির শরীর সতুর শরীর স্পর্শ করল, 'ঘিন্না কর?'
> সতু মাথা নাড়ল, 'না। তুমি আমার চোখে পবিত্র।'...প্রায় এক মিনিট পরে পিছন থেকে বাঁ হাত এনে তুলে ধরল, 'দ্যাখ, আমার হাত কাইটা দিছে। পাঁচ বছর যখন আমার বয়স।'
> সতু কাটা হাতটি দেখল। আস্তে, সাবধানে, সন্তর্পণে সেই ছিন্ন শেষাংশ স্পর্শ করল। ওখানটা একটু লাল। নরম।
> 'কারা কেটেছে?'
> 'জানি না। হিন্দু হইতে পারে। মোছলমান হইতে পারে।'...
> সতুর স্বর ফিসফিস শোনাল, 'তুমি জমিন।'
> 'তুমি পলাও ক্যান?' মোতির শরীর সতুর শরীরের আরও ঘন সান্নিধ্যে এল। সতু কোনও জবাব দিতে পারল না। ওর চোখের কোণ এখনও ভেজা। ...
> 'রাত্রে বাড়ির ভিতরে ঢোকার দরজা খুইলা রাইখো।' ডান হাতের মেহেদি মাখানো তর্জনী দিয়ে সতুর বুকে স্পর্শ করল, 'কাছেপিঠে সজাগ থাইকো। তোমার কাছে যামু।'
> মোতি হিজল আর শ্যাওড়ার কৃষ্ণ-সবুজ জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল। (সমরেশ, ২০০৯ :

৬৮৭-৮৮)

বাংলার হিজল আর শ্যাওড়ার কৃষ্ণ-সবুজ জঙ্গলের আলো-আঁধারে সৃষ্ট এক কুহক-বাস্তবতার স্থান-কাল ছিন্ন পরিস্থিতিতে, সমরেশ বসু সতু আর মোতিকে, ভিন্ন কাঠামোয় প্রতীকী-অভিমুখে রূপকল্পময় করেছেন। পারিপার্শ্বিকতার বিহ্বলতা নির্মাণে ঔপন্যাসিক এখানে অতুলনীয় শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

সতুর সেটেলমেন্টে হারিয়ে যাওয়া সম্পর্কে বিজু-গোরার জেরার পর, বিষয়টা রহস্যময় ব্যাপার হিসেবে পরিত্যক্ত হয়। ওয়ার্ডার সত্যেন নাহাও সন্দিগ্ধ চোখে সতুকে দেখছিল। সতু মোতি প্রসঙ্গে কিছুই স্বীকার করেনি। জাব্বরের বাড়ি হরিসূদনের বাড়ি থেকে বেশি দূরে নয়। জাব্বর সকলকে অভ্যর্থনা জানায়, টেবিলের পরে উজ্জ্বল আলো জ্বলছে। উপস্থিত ছিলেন বিক্রমপুরের রমেশ ভৌমিক, বাজারের সব থেকে বড়ো কাপড়ের দোকানের মালিক অরিন্দম সাহা এবং দিনাজপুর জেলার মুসলিম লিগের বিশিষ্ট নেতা সৈয়দ মনিরুজ্জমান।

প্রথম পরিচয়ে 'পোকায় কাটা পাকিস্তান' কথাটা বারবার শোনার মধ্যেই জাব্বরের ক্ষোভের উৎস নিহিত ছিল। এ কারণে কলকাতা থেকে বিভক্ত নতুন দেশ দেখতে আসা তরুণদের কাছে নিজের মনোবেদনা প্রকাশ করলেও পরে অনুতপ্ত হয়ে সন্ধ্যায় নিজ বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়েছে। সেখানে এসে সতু দেশভাগের অনিবার্যতা সম্পর্কে নিজের মনে উত্থাপিত কিছু প্রশ্ন জাব্বরের কাছ থেকে জানতে চেয়ে মূলত মুসলমানদের ভাবনা সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা লাভ করে। জাব্বর জানতে চায় : 'আপনার রাজনৈতিক কোনো আদর্শ বা মতামত আছে?' এর উত্তরে সতু জানায় : 'আদর্শ আছে কি না বলতে পারি না। তবে কমিউনিস্ট পার্টির দিকে আমার একটা সমর্থন আছে। সেটাকে দারিদ্র্য মোচনের কারণে বলতে পারেন। নিজেকে একজন খাঁটি কমিউনিস্ট আমি বলতে পারি না। পার্টি সমর্থক সিমপ্যাথাইজার...' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৯০)

সৈয়দ মনিরুজ্জমানের অভিমত, কমরেড মানবেন্দ্র রায় ছাড়া ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি পাকিস্তানের দাবিকে ন্যাশনাল মাইনরিটির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বলে মেনে নিয়েছিল। এ নিয়ে পি.সি. যোশী লিখেছেন ও বঙ্কিম মুখোপাধ্যায় বিবৃতিও দিয়েছেন। তারপরও দেশভাগ ছাড়া কি এটা সম্ভব ছিল না? সতুর এমন প্রশ্নের উত্তরে জাব্বর জানায় : 'পাকিস্তানের দাবি শুধু মাইনরিটি মোছলমানের কমিউনাল দাবি না, সমস্ত ভারতের কালচারাল মাইনরিটির জাতীয় দাবি' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৯০)। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র বিজুর কাছে এটা 'বিপজ্জনক দাবি' বলে মনে হয়। কারণ বিচিত্র ধর্মের মানুষের আবাসভূমি ভারতে এমন দাবি ভবিষ্যতে শিখসহ আরও অনেক সম্প্রদায়ই করতে পারে যা কোনো শুভ পরিণতি আনবে না। দিনাজপুর জেলার মুসলিম লিগের খ্যাতনামা নেতা সৈয়দ মনিরুজ্জমানের

কণ্ঠেও বঞ্চিতের বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। তার বিশ্বাস :

> ...ইংরাজের একটা অপরাধ ছাড়া, কোনো অন্যায় কাজ তারা করে নাই। তারা যদি পাকিস্তান না কইরা দিয়া যাইত, তাহলে আমরা চিরকাল দশ কোটি মানুষ, তিরিশ কোটির গোলাম হইয়া থাকতাম। আপনাদের প্রত্যেকটা বিষয়ে দেখাইয়া দিতে পারি, হিন্দুদের কাছে আমরা ছোট, নীচ, নোকর। আমরা ভারতের মোছলমানরা হিন্দুর থেইক্যা আলাদা জাত। এমুন কি পশ্চিমা মোছলমানদের থেইক্যাও আমরা আলাদা। আপনারা আগুনের মতন দ্বিজাতিতত্ত্বের কথাটা বোধহয় মানতে পারেন নাই। তাতে হিন্দুদের সুবিধা হইতে পারত, আমাদের হইত না। তবে হ, ইংরাজরা কংগ্রেসের সঙ্গে বেশি দোস্তি করছে। আমাদের বাঙালি মোছলমানদের ঠকাইছে। খুলনা পাকিস্তানে আসার জন্য কইলকাতার হিন্দুরা প্রতিবাদ সভা করতেছে। মুসলমান-প্রধান জিলা খুলনার জন্য, এই প্রতিবাদের কারণ কী? আমরা কি মুসলমান-প্রধান মুর্শিদাবাদ ছাইড়া আনন্দে আছি? না কি থাকতে পারি? (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৯০)

তাঁর কণ্ঠে মুসলিম লিগ নেতৃবৃন্দ ও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর বিভেদনীতি ও কূটকৌশলের যে কর্মপরিকল্পনার বর্ণনা পাওয়া যায় তাতেই উন্মোচিত হয়েছে আসন্ন দুর্দিনের সংকেত :

> আমরা মোছলমানরা তো আছি বাংলায় আর পাঞ্জাবে। তবু ভাগাভাগি ছাড়া পুরা কিছু পাইলাম না। কইলকাতা আমাদের হাতছাড়া হইল। অথচ সাহেবরাই আমাদের নাচাইছে। তারপরে পশ্চিমা লিগের নেতারা, কায়েদে আজমও কইলকাতা ছাড়তে রাজি হইলেন। অথচ এই কায়েদে আজম একদিন কইছিলেন, কইলকাতা যদি পূর্ব পাকিস্তানরে না দেওয়া হয়, তা হইলে কোন অষ্টরম্ভাটা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু লাহোরের বদলে, আমাদের কইলকাতা জবাই করতে হইল। তবু নাজিমুদ্দিন সাহেব একটা মুড়ির মোয়া আমাদের হাতে দিলেন। শুনলাম, কইলকাতা ছাড়লে, সমস্ত দায় শোধ কইরাও আমরা নগদ তেত্রিশ কোটি টাকা পামু। তেত্রিশ কোটি টাকা দিয়া, আমাদের ঢাকা শহরেরে নাকি নিউইয়র্ক বানান হইব। 'আজাদ' 'মর্নিংনিউজ', 'স্টার অব ইন্ডিয়া' সব কাগজগুলো চুপ মাইরা গেল। আরে, পূর্বপাকিস্তানে ঢাকা ময়মনসিংহ কুমিল্লাতে তো হিন্দু মেজরিটি। সেই জিলাগুলাও তা হইলে হিন্দুস্তানে দিলা না ক্যান? যাউক, ছাড়েন এই কথা। কইলকাতা লাহোর লইয়া মার্কেট ভ্যালু আর বুক ভ্যালুর হিসাবেও যাইতে চাই না। তবে, আপনাদের কইতেছি, এই তেত্রিশ কোটি টাকা একটা ধাপ্পা। খুব শিগগিরই প্রমাণ হইব, আমরা কোনোদিনই তেত্রিশ কোটি পামু না। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৯০-৯১)

এসব কথা শুনে বিমর্ষ হলেও বিভক্ত দেশমাতৃকার প্রতি নিজের আবেগ প্রকাশ করে সতু সকলের উদ্দেশে বলেছে : 'দেখুন, আমি রাজনীতিক না। আমি গান্ধীজির সমর্থক। দেশ ভাগ হয়েছে। কিন্তু আমার কাছে তার কোনো সীমারেখা নেই। আমি আজ যেমন স্বাধীনতার আনন্দে এখানে এসেছি, আবার আসব। চিরদিন আসব। আমাকে কি

আপনারা তাড়িয়ে দেবেন?' (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৯১)। প্রশ্নোত্তরে মুসলিম লিগ নেতা সৈয়দ মনিরুজ্জামান স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছে :

> প্রয়োজন হইলে, দিমু। ...আপনি যদি রবীন্দ্রনাথের মতন, 'আর্য অনার্য শক হুন'দের লইয়া, 'মহাভারতের সাগরতীরে', আমাদের 'লীন' করার কথা কইতে আসতে চান, আপনাকে বিদায় দিমু। আত্মপ্রতিষ্ঠার বাধায় অহিংসা মানি না। কংগ্রেস আর হিন্দু মহাসভার থেইক্যাও রবীন্দ্রনাথ আরও বড় হিন্দু। তাঁরও কোনও বাস্তববোধ ছিল না। গান্ধী দ্বিজাতিত্ত্ব মানেন না। আসবেন, জনাব সত্যেশবাবু, ইউ আর ওয়েলকাম হিয়ার। কিন্তু গান্ধী রবীন্দ্রনাথের ঐ সব ধ্যান-ধারণা রাইখা আসবেন। মনে রাখবেন, আমাদের প্রাণে এখনো বঞ্চনার ঘা রইছে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৯১)

সতুর মনে হলো, মনিরুজ্জমান সাহেবের কথায়, রংপুরের সৈয়দ বদরুদ্দিন ইসলাম ও নট সেটেলমেন্টের ওয়ার্ডার সত্যেন নাহান স্বর যেন শুনতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে দুর্যোধনের জন্মমুহূর্তে, বেদব্যাসের উক্তি "দুর্দিন, সামনে বড় দুর্দিন।..." (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৯১)

গভীর রাত। হরিসূদনের ছেঁচাবেড়ার দরজা ধরে দাঁড়িয়ে সতু। বিজু গোরা ঘুমোচ্ছে। হরিদা ও বউদি ঘুমোচ্ছে তাদের ঘরে। সতুর দৃষ্টিকোণ থেকে একাধিক ইন্দ্রিয়ের মিশ্রণে, চিত্ররূপময় গীতময় রহস্যস্পন্দিত অপার্থিব পরিবেশ এঁকেছেন সমরেশ বসু। উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও এখানে পরিণামী রসনিষ্পত্তির প্রশ্নে তা অনিবার্য :

> একটু আগেই, কোথা থেকে রাত্রি বারোটার ঘণ্টার শব্দ ভেসে এসেছে। বাইরে জ্যোৎস্না যেন স্বপ্নের মায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। আজ কি পূর্ণিমা? নিবিড় গাছপালাগুলো জ্যোৎস্নায়, আলোয় আলোয় এক অলৌকিক রূপ ধরেছে। বাইরে ঝিঁঝির ডাক। রাত-জাগা পাখি ডাকে না। বাতাস নেই। জ্যোৎস্নাময়ী প্রকৃতি নির্বাক। ...
>
> সতু দেখল, জ্যোৎস্নার আলোয় এক অলৌকিক দেবীমূর্তি সহসা অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। আবার পরমুহূর্তেই যেন আরও কাছের জ্যোৎস্নায় ভেসে উঠল। মুহূর্তেই আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। তারপরেই সতুর শরীরে গায়ে কাঁটা দেওয়া স্পর্শ। মূর্তি সতুকে জড়িয়ে ধরল। সতু মূর্তিকে নিয়ে উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকল।
>
> ...সেই অলৌকিক দেবীমূর্তি নিজেকে সম্পূর্ণ অনাবৃত করল, বাঁশির মৃদুস্বর বেজে উঠল, 'আমার হাত কাটা, তাই তোমার ভাল লাগে না?'
>
> 'তুমি আমার সত্য, সুন্দর।' সতু মোতির কাটা হাতটা তুলে নিল, 'তুমি জমিন। তোমার ভাগ সকলে চায়।'
>
> 'তুমি তো চাও না বন্ধু?' মোতি সতুর পাজামা পরা, খালি গায়ের সঙ্গে নিজেকে লীন করতে চাইল। ...মুখ তুলল, '...এই জমিনে আমার সালাম।' ও মোতির পায়ের কাছে নত হয়ে পড়ল।
>
> মোতি তৎক্ষণাৎ নিঃশব্দে সতুর সামনে বসল। ওর চোখে জল, '...ইচ্ছা করে, তোমার লগে চিরকাল থাকি — দেখি তুমি কে।'...

> 'আমি তোমারই অংশ।' সতুর স্বরে আবেগ। মোতির চোখের জল মুছিয়ে দিল।
>
> সতু মোতির কাটা হাতটি আবার ঠোঁটের কাছে টেনে নিল। মোতি উঠে দাঁড়াল। নগ্ন সুবর্ণ দেবীমূর্তি, চিরযৌবনা। বিশ্বের চিরকালের আকাঙ্ক্ষা ওর অপলক দীর্ঘ আয়ত চোখের পিঙ্গল তারা দুটি সতুর দুই চোখে নিবদ্ধ, 'বন্ধু, এই কাটা জমিনে তুমি সালাম কর। একটু ভালবাসবা না?'
>
> সতু মোতির দুই ভুরুর মাঝখানে ঠোঁট ছোঁয়াল, 'তুমি আমার চিরদিনের ভালবাসা। তুমিই সেই মূর্তি। তুমিই সত্যি বলেছ। তোমার জাত নেই, তুমি জমিন। এই কাটা জমিনই আমার ভালবাসা।' ...
>
> সতু নিজের হাতে মোতিকে ঘাগরা পরিয়ে দিল। জামা পরিয়ে দিল গায়ে। মোতি মাথার চুল থেকে দশ টাকার ভাঁজ করা নোটটা বের করে মেঝেয় ছুড়ে ফেলে দিল। তারপরে সতুকে গাঢ় আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে ঠোঁটের ওপর আগ্রাসী চুম্বনে, যেন সকল কিছু গ্রহণ ও দান করতে চাইল। দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে, দরজার দিকে এগিয়ে গেল, 'বন্ধু, নটের মাইয়া কান্দে না। নিজের বুকে ছুরি মারে। আর কি কোনও দিন এই কাটা জমিনে আসবা?' ও দরজার কাছে দাঁড়াল।
>
> 'আসব, চিরকাল আসব।' সতু মোতির কাছে এগিয়ে গেল, 'এই জমিনেই যেন আমি চিরকাল জন্মাই।'
>
> অলৌকিক সুবর্ণমূর্তি ঘরের বাইরে চলে গেল। সতুও গেল। জ্যোৎস্নায়, ছায়ায়, ভেসে, ডুবে সেই মূর্তি কিছুতেই যেন অদৃশ্য হয় না। সে আলোয় ভেসে, ছায়ায় ডুবে চলতেই থাকে। বিজু আর গোরা সতুর দুপাশে এসে দাঁড়ায়। নির্বাক বিস্ময়ে সতুকে দেখছে। সতু দেখছে দূরে, দূরে — অনেক দূরে। (সমরেশ, ২০০৯ : ৬৯২)

খণ্ডিতার উপসংহার অংশের বুনট (texture) ও বর্ণন (narrative) সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বিভক্ত ভারতের তরুণ প্রজন্মের দৃষ্টিকোণ থেকে শরীরী আকর্ষণের দুর্নিবার উৎস মোতিকে সকলের আকাঙ্ক্ষার বস্তু হিসেবে কামনাময়ী, 'তার চলার ছন্দে একটা নাচের ভঙ্গি, যে-কারণে উদ্ধত বুকেও নাচের ছন্দ। প্রশস্ত সুঠাম নিতম্বে নাচেরই তাল।' — বর্ণিত হলেও শরীরী-চিত্রকে সমরেশ বসু ভেঙে দিয়েছেন, 'অগ্নিশিখার মতো', 'প্রতিমার মতো আকর্ণবিস্তৃত আয়ত চোখ', 'আমি জমিন', 'অলৌকিক দেবীমূর্তি', 'জমিনে আমার সালাম', 'তুমি পবিত্র', 'নগ্ন সুবর্ণ দেবীমূর্তি' প্রভৃতি বাক্যাংশ ও উপমান চিত্রের উদ্ভাবনায় ও ব্যবহারে। ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে ও দেবীকল্পনায়, সামূহিক নির্জ্ঞানে নগ্নতা নিষ্কাম নান্দনিকতায় উত্তীর্ণ হওয়ার সংস্কৃতি ভারতীয় ঐতিহ্যে সুলভই বলা চলে।

সমরেশ বসু উপন্যাস শেষের বর্ণনা-বুনটে স্বপ্ন আর বাস্তবের মধ্যকার ভেদরেখা অবলুপ্ত করেছেন। সমগ্র আবহটা এমনি এক রহস্যময়তায়, কুহকে ভরা যে, জ্যোৎস্নাময় রাত্রি, মোতি-সতু এবং আলো-আঁধারের পরস্পর সঞ্চরণশীলতাকে মনে হয় বুঝি-বা স্বপ্নই, সম্মোহনই, অন্যদিকে তারা আবার বাস্তবই, বাস্তবেরই ভিন্ন রূপ।

মণিবন্ধ থেকে হাত-কাটা মোতি, যাকে হিন্দু-মুসলমান সকলেই চাষ করতে চায়, যে জমিন — পাঁচ বছর বয়সে তার হাত কেটেছে মিথ্যে ক্রোধে, তারা হিন্দু না মুসলমান তাও সে জানে না। খণ্ডিতা দেশের প্রতীকে কর্তিত বাংলা, তার লাঞ্ছনাকে বয়ে বেড়াবে কত কাল? তাদের দৃষ্টি 'দূরে, দূরে — অনেক দূরে' বর্ণনায় প্রতীকটি সম্প্রসারিত হয়েছে প্রতীক্ষিত আর এক বিনির্মিত প্রতীকে। ভারতের রাজনৈতিক বিপর্যয়-দুর্যোগ, আত্মত্যাগ ও ষড়যন্ত্রতত্ত্ব, বিভক্ত ভারত তথা ছিন্ন বাংলার বেদনা-বিষণ্ণতা ও ভবিষ্যৎ স্বপ্ন, *খণ্ডিতার* অন্তিমে এসে যেন অনুচ্চারিত পার্থিব আকাঙ্ক্ষার প্রতীকী দ্যোতনায় অনুরণিত হয়।

টীকা

১. ১৯৪৬ সালে মাসিক 'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা 'আদাব' ছোটগল্প প্রকাশের মাধ্যমে সম্ভাবনাময় সাহিত্যিক হিসেবে প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত দেন সমরেশ বসু। "শের সর্দার" নামে একটি ছোটগল্প দৈনিক 'স্বাধীনতা' পত্রিকায় ইতঃপূর্বে প্রকাশিত হয় বলে ড. নিতাই বসু *কালকূট সমরেশ* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য, এ গল্পের লেখক হিসেবে বন্ধু দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায় সুরথনাথের সাহিত্যিক নাম সমরেশ বসু নির্ধারণ করেন। দ্রষ্টব্য : ড. নিতাই বসু, *কালকূট সমরেশ*, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, কলকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩৯৪, পৃ. ৪৮

বাঙালির আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দুঃসহ রক্তাক্ত অভিজ্ঞতার শিল্পরূপ 'আদাব' ছোটগল্প। মুসলমান মাঝি ও হিন্দু সুতা-মজুর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মাঝখানে পড়ে প্রাণভয়ে ভীত হয়ে ডাস্টবিনের দু-পাশে আত্মগোপন করে। পারস্পরিক পরিচয়ের সংশয় ও অবিশ্বাস অতিক্রম করে তাদের দুজনের কথোপকথনে তৎকালীন সাম্প্রদায়িক রাজনীতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে :

"আইচ্ছা...মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোন আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে। — আইচ্ছা কইতে পারনি — এই মাই'র-দই'র কাটাকুটি কিয়ের লেইগা?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণকণ্ঠেই জবাব দিল সে, দোষ তো তোমাগো ওই লীগওয়ালাগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল — হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কি? তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কি উপকারটা হইব?

আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কি, হইব আমার এই কলাডা — হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে। — তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেরাইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পরল আমার ঘারের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুর পায়ের উপুর পা দিয়া হুকুমজারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

মানুষ না, আমরা য্যান্ কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি; নাইলে এমুন কামরা-কামরিটা লাগে কেম্‌বায়? নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু হাত দিয়ে হাঁটু দুটোকে জড়িয়ে ধরে।"

সমরেশ বসু, "আদাব", সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড : কলকাতা, ১৪ মে ১৯৮৮, ৫৫ বর্ষ ৮৮ সংখ্যা, পৃ.১৬-১৮

২. গ্রন্থাকারে *খণ্ডিতার* প্রথম প্রকাশ : আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা থেকে ১৯৮৭ সালে। *খণ্ডিতা* সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড : কলকাতা থেকে ২০০৯ সালে *সমরেশ রচনাবলী* ১৩ খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

অমল হোড় (সম্পাদিত), ১৯৯৩। *সমরেশ বসু : জীবন ও সাহিত্য*, এ.সি-ই, কলকাতা।

অলোক রায়, ২০০০। *বাংলা উপন্যাস প্রত্যাশা ও প্রাপ্তি*, "শিকড়ের সন্ধানে সমরেশ বসু", কলকাতা।

অশোক সরকার, ২০০০। "খণ্ডিতা" *সমরেশ বসু : মানুষের কথাকার*, স্বপন দাসাধিকারী সম্পাদিত, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

আলম খোরশেদ, ২০১৬। *সমরেশ বসুর উপন্যাস সময় মানুষ ও শিল্প*, অঙ্কুর প্রকাশনী, ঢাকা।

ঝুমা রায়চৌধুরী, ২০০৭। *কথাসাহিত্যে সমরেশ বসু : সামগ্রিক মূল্যায়ন* (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বাশা, কলকাতা।

দিপালী নাগ, ১৪১২। *এবং মানুষ : সমরেশ বসুর গল্প*, বঙ্গসাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

নবকুমার বসু, ২০০৫। *চিরসখা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা।

নিতাই বসু, ১৯৮৯। *সমরেশ বসুর একান্ত সাক্ষাৎকার*, মৌসুমী প্রকাশনী, কলকাতা।

—, ১৩৯৪। *কালকূট সমরেশ*, জগদ্ধাত্রী পাবলিশার্স, কলকাতা।

নিমাই বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯৬। *প্রাক্-'বিবর' পর্বে সমরেশ বসু*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৯। *সমরেশ বসু : সময়ের চিহ্ন*, কলকাতা।

—, ১৯৯১। *উপন্যাস রাজনৈতিক*, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, কলকাতা।

পারভীন আক্তার, ২০১২। *সমরেশ বসুর মিথিক উপন্যাসের বিষয় ও শিল্পরূপ*, ধ্রুবপদ, ঢাকা।

মুকুল মণ্ডল, ২০১৫। *সমরেশ বসুর উপন্যাসে বিশ্বাসের সংকট থেকে উত্তরণ*, কবিতিকা, মেদেনীপুর।

শম্ভুনাথ চক্রবর্তী, ১৯৯৫। *কালকূট সাহিত্যের সন্ধানে*, সাহিত্যায়ন, কলকাতা।

সত্যজিৎ চৌধুরী, নিখিলেশ্বর সেনগুপ্ত, বিজলি সরকার, (সম্পাদিত), ১৯৯৪। *সমরেশ বসু : স্মরণ সমীক্ষণ*, চয়নিকা, কলকাতা।

সমরেশ বসু, ১৯৮৭। "কেন গান্ধী", 'দেশ', ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা।

—, ২০০৯। *সমরেশ রচনাবলী*, খণ্ড ১৩, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা. লি., কলকাতা।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৮। "জীবন ও শিল্পের যুগলবন্দী", 'দেশ', সমরেশ বসু স্মরণে, আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, কলকাতা।

স্বপন দাসাধিকারী, (সম্পাদিত), ২০০০। *সমরেশ বসু : মানুষের কথাকার*, পুস্তক বিপণি, কলকাতা।

হিতেন্দ্র মিত্র, ১৯৯৫। *সমরেশ বসু : মুক্তিপন্থার সন্ধান*, প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা।